শুকতারা

অজানা দ্বীপের বিভীষিকা

অষ্টাত্রিংশৎ বর্ষ
সপ্তম সংখ্যা
ভাদ্র • ১৩৯২

দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর

সকলের প্রত্যাশা পূর্ণ করতে বেরুচ্ছে

শারদীয়া শুকতারা

দেব সাহিত্য কুটীরের শারদ-উপহার

গল্প, উপন্যাস, মজার মজার লেখা আর ছবিতে ভরা তোমাদের প্রিয় পত্রিকার প্রথম শারদীয়া সংখ্যা একাই একশ।

যাঁদের লেখা তোমরা ভালোবাসো তাঁরা প্রায় সকলেই দারুণ দারুণ সব গল্প, উপন্যাস লিখেছেন। হাসির উপন্যাস, গা ছম ছম করা অ্যাডভেঞ্চার, গোয়েন্দা কাহিনী, ভূতের গল্প, খেলার উপন্যাস আর পান্ডব গোয়েন্দা তো আছেই। লিখছেন–

বিমল মিত্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, প্রেমেন্দ্র মিত্র, আশাপূর্ণা দেবী, সমরেশ বসু, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, প্রফুল্ল রায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়, বুদ্ধদেব গুহ, অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ, ষষ্ঠীপদ চট্টোপাধ্যায়, অনিল ভৌমিক, শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায় এবং আরও অনেকে।

শারদীয়া শুকতারার আর একটি বড় আকর্ষণ ছবিতে গল্প। রঙিন ও সাদা কালোয় ছাপা এই চিত্র-কাহিনীগুলি এক কথায় দুর্ধর্ষ।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বাঁটুল দি গ্রেট

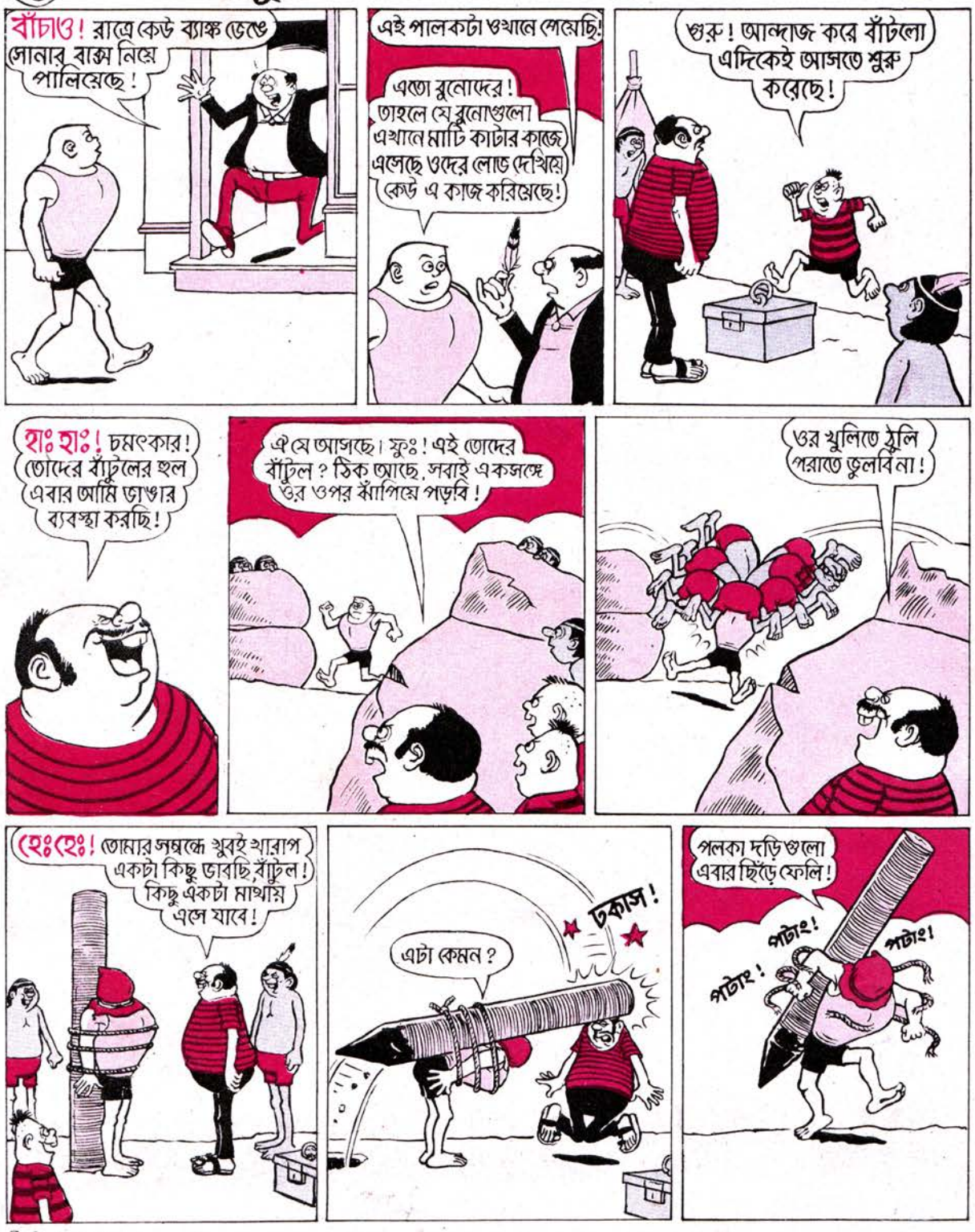
বাঁচাও! রাত্রে কেউ ব্যাঙ্ক ভেঙে সোনার বাক্স নিয়ে পালিয়েছে!
এই পালকটা ওখানে পেয়েছি!
এতো বুনোদের! তাহলে যে বুনোগুলো এখানে মাটি কাটার কাজে এসেছে ওদের লোভ দেখিয়ে কেউ এ কাজ করিয়েছে!
গুরু! আন্দাজ করে বাঁটলো এদিকেই আসতে শুরু করেছে!
হাঃ হাঃ! চমৎকার! তোদের বাঁটুলের হুল এবার আমি ভাঙার ব্যবস্থা করছি!
ঐ যে আসছে। ফুঃ! এই তোদের বাঁটুল? ঠিক আছে, সবাই একসঙ্গে ওর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বি!
ওর খুলিতে ঠুলি পরাতে ভুলবি না!
হেঃ হেঃ! তোমার সম্বন্ধে খুবই খারাপ একটা কিছু ভাবছি, বাঁটুল! কিছু একটা মাথায় এসে যাবে!
এটা কেমন?
ঢকাস!
পলকা দড়িগুলো এবার ছিঁড়ে ফেলি!
পটাং!
পটাং!
পটাং!

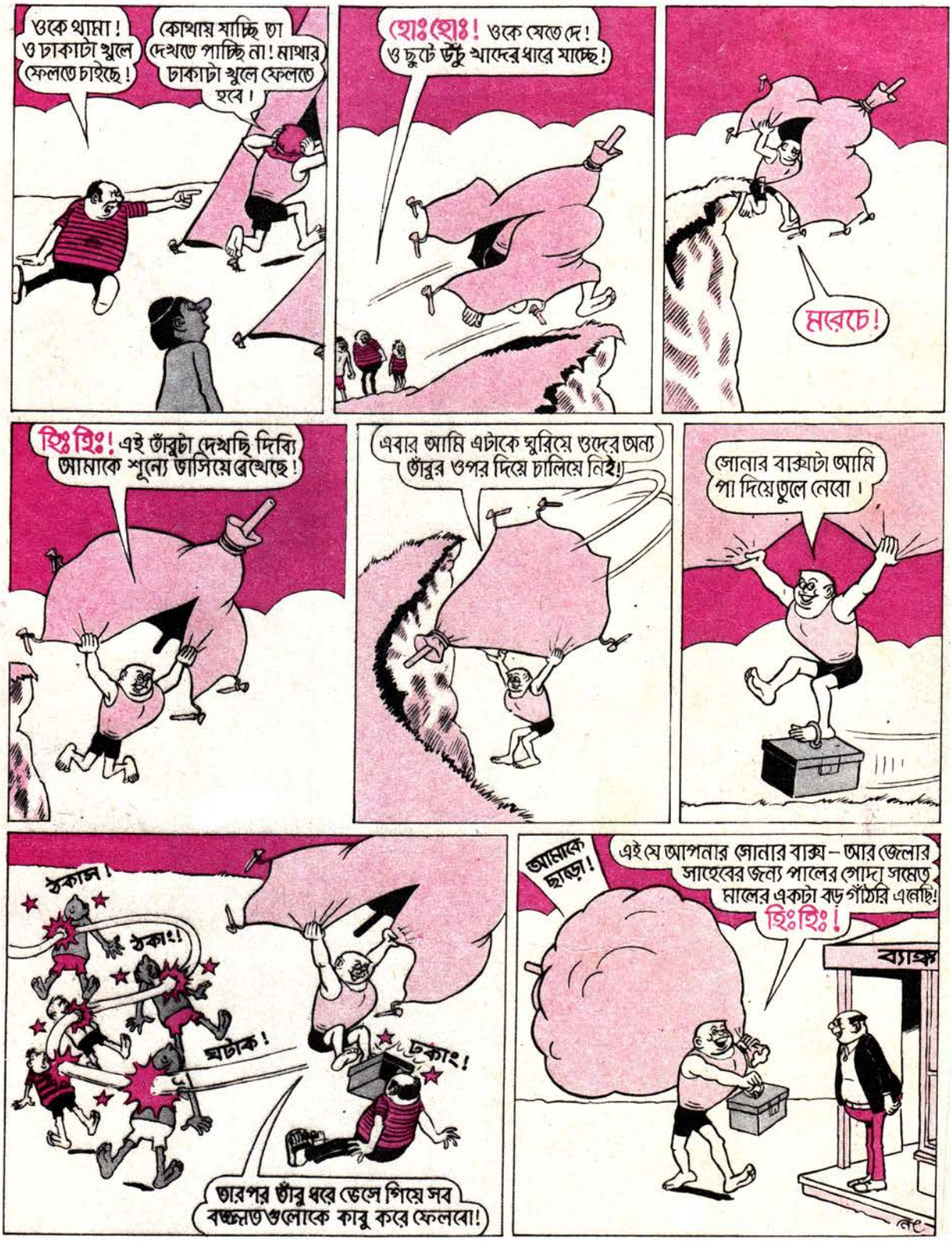
ওকে থামা! ও ঢাকাটা খুলে ফেলতে চাইছে!
কোথায় যাচ্ছি তা দেখতে পাচ্ছি না! মাথার ঢাকাটা খুলে ফেলতে হবে!
হোঃহোঃ! ওকে যেতে দে! ও ছুটে উঁচু খাদের ধারে যাচ্ছে!
মরেচে!
হিঃহিঃ! এই তাঁবুটা দেখছি দিব্যি আমাকে শূন্যে ভাসিয়ে রেখেছে!
এবার আমি এটাকে ঘুরিয়ে ওদের অন্য তাঁবুর ওপর দিয়ে চালিয়ে নিই!
সোনার বাক্সটা আমি পা দিয়ে তুলে নেবো।
ঠকাস!
ঠকাং!
ঘটাক!
ঢকাং!
তারপর তাঁবু ধরে ভেঙে গিয়ে সব বজ্জাতগুলোকে কাবু করে ফেলবো!
আমাকে ছাড়!
এই যে আপনার সোনার বাক্স – আর জেলার সাহেবের জন্য পালের গোদা সমেত মালের একটা বড় গাঁঠরি এনেছি!
হিঃহিঃ!
ব্যাঙ্ক

শুকতারা

ভাদ্র, ১৩৯২

APPROVED BY THE DIRECTORATE OF PUBLIC INSTRUCTION, WEST BENGAL AS CHILDREN'S MONTHLY MAGAZINE VIDE MEMO NO. 439/1 (2) T. B. C. (Dated 25th January 1982. 2a-2t/81)

সূচীপত্র

বিষয়	লেখক/লেখিকা	পৃষ্ঠা
১।	অজানা দ্বীপের বিভীষিকা (ছবিতে গল্প)–নারায়ণ দেবনাথ	প্রচ্ছদ
২।	বাঁটুল দি গ্রেট (রঙিন ছবিতে গল্প)–নারায়ণ দেবনাথ	৪৮১
৩।	ছবির পিকনিক (কবিতা)– রবি গঙ্গোপাধ্যায়	৪৮৫
৪।	রামধনুর সন্ধানে (রঙিন ছবিতে গল্প)–ময়ূখ চৌধুরী	৪৮৬
৫।	মন্মথ সেন আর তিন বন্ধু (অগ্নিযুগের সৈনিক)– সুধীন্দ্রনাথ রাহা	৪৮৮
৬।	জলদস্যুর ছেলে (গল্প)–রবিদাস সাহারায়	৪৯৩
৭।	গুপ্তধনের সন্ধানে (ছবিতে গল্প)–হেমেন্দ্রকুমার রায়	৪৯৮
৮।	একদিনের বিড়ম্বনা (জীবন কথা)–দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়	৫০০
৯।	হারায়নি (ভূতের গল্প)–জগবন্ধু হালদার	৫০৪
১০।	ছবির মজা – অমল	৫০৮
১১।	যাদুর দেশে টারজান (অ্যাডভেঞ্চার)–সব্যসাচী	৫০৯
১২।	খেলাধূলা– শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়	৫১৫
১৩।	অলৌকিক (সত্য ঘটনা)–নন্দলাল ভট্টাচার্য	৫২৭
১৪।	হৃদয়পুরের রাজা (রূপকথা)–সলিল মিত্র	৫৩০
১৫।	মুন্ডু পাহাড়ের ভয়ংকর (শিকারের গল্প)–সুভাষ চৌধুরী	৫৩৪
১৬।	জল জঙ্গলের দেশে (সুন্দরবনের গল্প)–শচীন দাশ	৫৪০
১৭।	বিলাস ও অন্ধ ভিখারী (প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)–স্বপন রায়	৫৪৫
১৮।	সুস্মিত পাল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতা (ঘোষণা)	৫৪৬
১৯।	কেন? (দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত গল্প)–সুব্রত মজুমদার	৫৪৭
২০।	হাঁদা-ভোঁদা (ছবিতে মজার গল্প)–নারায়ণ দেবনাথ	৫৪৮
২১।	মজার পাতা (ধাঁধা ইত্যাদি)–	৫৫০
২২।	দাদুমণির চিঠি–	৫৫৩
২৩।	তোমাদের পাতা–	৫৫৪
২৪।	সাহেব বাংলোর ভূত (ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস)–স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায়	৫৫৬

বি. সি. মজুমদার কর্তক নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিঃ, ৬৮ কলেজ স্ট্রীট, কলিকাতা হইতে মুদ্রিত ও ১১ নং ঝামাপুকুর লেন, কলিকাতা হইতে শ্রী অরুণচন্দ্র মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও সম্পাদিত।

গ্রাহক চাঁদা–বার্ষিক–সডাক ৪২ টাকা, ষান্মাসিক–২১ টাকা। মূল্য—টাঃ ৩·৫০

ছবি দেখতে ছোটরা ভালোবাসে। রংচংয়ে ছবি হলে তো কথাই নেই। সেই দিকে নজর রেখে

দেব সাহিত্য কুটীর

একের পর এক বের করে চলেছেন অফসেটে ছাপা রংবেরংয়ের ছবিতে ভরা সব বই। ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে অ, আ, ক, খ, এ, বি, সি, ডি, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ আরও অনেক কিছু।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের

বর্ণপরিচয়

(প্রথম ভাগ)

দাম : ৫.৫০ পয়সা মাত্র

অফসেটে ছাপা বড় আকারের নতুন বই। আগাগোড়া চার রংয়ে ছাপা অজস্র ছবিতে ভরা বর্ণপরিচয়ের নবতম সংস্করণ।

খুশির পড়া দাম : ৬.০০ মাত্র

খুশি হয়ে পড়ার মতো বই-ই বটে। পাতায় পাতায় রংয়ের বাহার, ঝকঝকে সব ছবি ছোটদের তাক লাগিয়ে দেবে।

গুণতে মজা দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবি আর ছড়া দিয়ে ছোটদের যেমন গুণতে শেখানো হয়েছে তেমনি শেখানো হয়েছে যোগ, বিয়োগ করতেও। ছবি দেখে ছড়া পড়তে পড়তেই ছোটরা শিখে যাবে অংকের প্রথম পাঠ

খোকাখুকুর ABC দাম : ২.৫০ মাত্র

বাংলার সাহায্যে ইংরাজি শেখানোর বই আর বোধহয় নেই। রংচংয়ে ছবি দেখতে দেখতেই ছোটরা শিখে যাবে ইংরাজি অক্ষরমালা।

আদর্শ লিপি ও সহজ বর্ণপরিচয় দাম : ৬.০০ মাত্র

ছোটদের বর্ণপরিচয়ের এক মজাদার বই। একটি বইয়েই বাংলা, ইংরাজি, হিন্দি আর উর্দু বর্ণমালা শেখার সুযোগ রয়েছে।

ছবিতে ভারতের ইতিহাস

দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র

দেশের কথা জেনে ছোটরা যাতে বড় হতে পারে সেইজন্যেই চার রংয়ে ছেপে নাম মাত্র দামে বার করা হয়েছে এই বইটি।

ছোটদের চিড়িয়াখানা	আগড়ুম বাগড়ুম	ইকড়ি মিকড়ি
দাম : ২.৫০ পয়সা মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র	দাম : ২.৫০ মাত্র

ছবিতে ভরা ছোটদের ভালো লাগার মতো দারুণ তিনটি ছড়ার বই। হাতে পেলে ছোটরা এর একটিও ছাড়তে চাইবে না।

দেব সাহিত্য কুটীর ২১ ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৯

শুকতারা

৩৮শ বর্ষ • ৭ম সংখ্যা • ভাদ্র, ১৩৯২ আগষ্ট, ১৯৮৫

ছবির পিকনিক

রবি গঙ্গোপাধ্যায়

বুলু আর রাকাতে
খুব ঝুঁকে আঁকাতে
ব্যস্ত। কী আঁকছে?
শাদা নদী বাঁকছে
সারি সারি তালগাছ
পুকুরে লাফায় মাছ
ধূ ধূ মাঠ প্রান্তর
গ্রাম ও গ্রামান্তর

ভেজা লাল রাস্তায়
একা লোক হেঁটে যায়
নিচু নীল আকাশে
পাখি ওড়ে আভাসে
ঝাউগাছ থমকায়
খরগোশ চমকায়
তুলি আর কালিতে
কাগজের ফালিতে
বুলু রাকা আঁকছে।
সৌম্য কি হাসছে?
হাসির কি? ঠিক ঠিক
এমনি তো পিকনিক।
ছবিতে তাব'লে সব
দেখানো কি সম্ভব?
হাঁড়ি কুঁড়ি ধোঁয়াতে
শীতে রোদে রোঁয়াতে
পুচকার কান্না
টক ঝাল রান্না
খিচুড়ির আস্বাদ
ছবিতে যাবেই বাদ

পাখিদের সেই ডাক
রয়ে যাবে ঠিক ফাঁক
কোথা পাবে সব ঠিক
ছবিতে যে পিকনিক
বুলু আর রাকাতে
তারকের খাতাতে
আঁকছে তো আঁকছেই
পড়া নেই শোনা নেই।

ছবিঃ দিলীপ দাস

আরে!
এটা দেখছি কাঠের মূর্তি!
কলসের গায়ে লিখিত লিপিতে যার সন্ধান করতে বলা হয়েছে, এটাই বোধহয় সেই ব্যাঘ্র যে থাকবে না!

!
কে আমায় বিরক্ত করতে এসেছ?

কে তুমি?
আমি স্বর্গবাসী এক দেবতা। এই দ্বীপে এক জাদুকরের বিরুদ্ধাচরণ করেছিলাম বলে সে ছলবলে আমাকে এই ব্যাঘ্রাকৃতি কাঠের খাঁচায় বন্দী করেছে। সূর্যের আলো স্পর্শ করলে আমি মুক্তি পাব…

কাঠের তৈরি এই বিশাল খাঁচাটাকে তুমি বাইরে সূর্যালোকে নিয়ে যেতে পারবে?
আমার দুটি প্রশ্নের উত্তর দিলে হয়তো তোমাকে উদ্ধার করতে পারব। আগে বলো, কেমন করে কৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে হত্যা করতে পারব। দ্বিতীয় প্রশ্ন — কোথায় পাব রামধনুর সন্ধান?

কৃষ্ণ ব্যাঘ্রকে হত্যা করতে চাও? তাহলে, মহারাজ দুর্যোধনকে স্মরণ করো।
এই কথার অর্থ?
হুম!

শীঘ্র বলো — তোমার কথার অর্থ কী?
চিন্তা করো। আর কিছু বলব না।

এইবার তোকে পেয়েছি!
গদাঘাতে উরু ভগ্ন হয়ে মহারাজ দুর্যোধনের মৃত্যু হয়েছিল। সম্ভবতঃ কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের একমাত্র দুর্বল স্থান তার উরু… আচ্ছা, দেখি তাহলে চেষ্টা করে —

গুহার ভিতর থেকে একটি পাথর তুলে নিয়ে কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের উরু লক্ষ্য করে ছুঁড়ল অশনি…
আঃ!

না,না, আমার উরুতে আর আঘাত কোরো না। আমার উরু দুর্বল। উরু ভগ্ন হলে আমি চলাফেরা করতে পারব না, — ফলে অনাহারে মৃত্যু নিশ্চিত।

যদি বাঁচতে চাও, তাহলে যা-বলি তা-ই করো। কাষ্ঠনির্মিত এই ব্যাঘ্রমূর্তির শিকল ধরে ওটাকে বাইরে সূর্যের আলোতে নিয়ে চলো।

কৃষ্ণ ব্যাঘ্রের নাগালের বাইরে থেকে অতি সাবধানে ধুলোর উপর নিজের পায়ের চিহ্ন অনুসরণ করে মল্লভূমির দিকে এগিয়ে চলল অশনি ... তার নির্দেশ অনুসারে কাঠের তৈরি ব্যাঘ্রমূর্তির শিকল ধরে এগিয়ে চলল কৃষ্ণ ব্যাঘ্র...

আমি আলোর আভাস পাচ্ছি।

অবশেষে তারা এসে পড়ল মল্লভূমিতে মুক্ত প্রাঙ্গনের উপর...

সূর্যের আলো তোমার দেহস্পর্শ করেছে। এবার বলো - কোথায় আছে রামধনু?

অবশেষে আমি মুক্তি পেলাম!

অকস্মাৎ ভগ্ন কাষ্ঠস্তূপের ভিতর থেকে উঠে দাঁড়াল এক অপার্থিব মূর্তি!...

আমি জানি না রামধনু কোথায় আছে। তবে কিন্নররাজ শলভ জানে রামধনুর সন্ধান, আর শলভের সন্ধান জানে কৃষ্ণ ব্যাঘ্র।

মুহূর্তের জন্য অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল কুমার অশনি...

শলভের সন্ধান তুই পাবি না। তোকে আমি হত্যা করব।

14

[চলবে]

মন্মথ সেন আর তিন বন্ধু

সুধীন্দ্রনাথ রাহা

গোপলা নস্কর চলেছে গাঁয়ের রাস্তায়। এদিক থেকে ডাকছেন হরি ভট্চাজ, ওদিক থেকে ডাকছেন ছিমন্ত মিত্তির। ইনি বলছেন–"কলকেটা ধরে উঠেছে, এক টান দিয়ে যা গোপাল" উনি হাঁকছেন–"অনেকগুলো বেগুন তুলেছি, পোড়ালে যা তার হবে তাতে, নিয়ে যাও গোপালদা গোটাকতক–"

অথচ ছয় মাস আগেও হরি ভট্চাজ গোপলার কান ধরে গালে চড়িয়ে দিয়েছিলেন বাজারের মাঝখানে, তিনটে টাকা হাওলাত নিয়ে দুই বছরেও তা শোধ করে নি বলে। আর ছিমন্ত মিত্তির? হাঃ হাঃ হাঃ–উনি যে কী অকথা-কুকথা রটান নি গোপলার নামে, সেইটেই বলা শক্ত। বলেছেন মিথ্যুক, বলেছেন দমবাজ, এমন কি চোর পর্যন্ত বলতে মুখে আটকায় নি মিত্তিরের। তাঁর গোলা কেটে ধান বার করে নিয়ে গিয়েছিল তিন মাস আগে, ঐ শ্রীমান ছাড়া সে আর কে?

মাত্র ছয় মাস আগে সুরটা পালটাতে শুরু করল। মুচকুন্দপুর থানায় বোমা ফাটবার পর থেকে। দারোগা সন্তোষ হালদার সেদিন সবেমাত্র ধড়াচূড়া পরে কোয়ার্টার থেকে বেরুচ্ছেন, এমন সময়ে থানাঘরে ঠিক তাঁর চেয়ারের নিচেই ফাটল বোমা। রাইটার নাজিম খাঁ ছাড়া ঘরে তখন অন্য কেউ ছিল না, তা সেও ছিল একেবারে কোণের দিকে, আলমারি দুটোর ওপাশে। আলমারি দুটোই খুব জখম হলো বটে, কিন্তু নাজিমকে তারা বাঁচিয়ে গেল।

এদিকে চেয়ার ভেঙেছে, টেবিল গুঁড়ো হয়েছে, আগুন ধরে গিয়েছে খাতাপত্রের গাদায়। পাকা দেয়ালে ইয়া ইয়া গজাল বিঁধে ডজনে ডজনে। ওর একটা যদি বিঁধতে পারত নাজিম রাইটারের গায়ে, গ্যাংগ্রিন হতো নির্ঘাৎ।

তবে কথা এই, বোমা-বসানোর লক্ষ্য যে নাজিম রাইটার নয়, খোদ সন্তোষ হালদার, এতে কারও কোনো সন্দেহ তখনও ছিল না, এখনও নেই। দারোগাটি, যেমন হওয়া উচিত দারোগাদের, একান্তই সময়নিষ্ঠ। সকাল আটটা আর বিকেল তিনটে, এই হলো তাঁর থানাঘরে হাজিরার বাঁধা টাইম। এর হেরফের হতে নাজিম রাইটার কখনো দেখে নি, সুখদেও তেওয়ারী রামভুজং চৌবে ফতে সিং কনস্টেবলরাও এযাবৎ দেখে নি কোনোদিন।

কিন্তু সেদিন–অর্থাৎ রাখে হরি মারে কে!

আগের রাতে হালদার মশাইকে বড় বড় কাঁকড়া খেতে

হয়েছিল দুটো। পাকা মাল একদম। তায় আবার দারোগা গিন্নী প্রচুর ঘি-গরম মসলা দিয়ে রান্না করে সে-মালকে করে তুলেছিলেন যেমন উপাদেয়, তেমনি গুরুপাক। গরম গরম লুচি সহযোগে সেই কাঁকড়ার কোর্মা আকণ্ঠ সেবনান্তে সারা রাত বিনিদ্ররজনী যাপন করতে হয়েছে দারোগাকে, পেটের ভিতর হুড়ো-হুড়ি করেছে যেন তিনটে হুলো বেড়াল। ফলে কোয়ার্টার থেকে বেরুতে দেরি হয়ে গেল–

বেশি না, দুই মিনিট। পেটও ভাল না, দেরিও হয়ে গেছে, কাজেই চা-খাওয়ার পর্বটা যথাসম্ভব সংক্ষেপ করে সময়ের অপব্যয়টা প্রায় পূরণ করেই এনেছিলেন দারোগা। কিন্তু ঐ দুটো মিনিটের পূরণ করা আর কোনোমতেই সম্ভব হলো না।

আর ঐ দুটো মিনিটের জন্যই প্রাণটা রক্ষা হয়ে গেল দারোগার। আটটার সময়ে থানাঘরের চেয়ারে তাঁর বসবার কথা ছিল, সেই আটটাতেই ফাটল বোমা। কাঁটায় কাঁটায় আটটায়। দারোগা তখন বেশী দূরে নয়, কোয়ার্টারের দরোজায়। সে-দরোজা থেকে এই চেয়ার, ঠিক দুটো মিনিটের দূরত্ব।

অতএব, বোমার লক্ষ্য যে সন্তোষ দারোগাই ছিলেন, তাতে আর সন্দেহ কী?

তা লক্ষ্য না-হয় দারোগাবাবুই হলেন, কিন্তু নাটের গুরুটা কে? বোমা এখানে কে রেখে গেল? সন্ত্রাসবাদ? ও উপসর্গ তো কোনোদিন নেই সন্তোষ দারোগার এলাকায়! এখানকার ছেলে-ছোকরা সবাইকেই তো শিষ্ট সুবোধ বলে জানেন দারোগা! হাটেবাজারে বিলিতী কাপড়ের বহ্ন্যুৎসবও নেই এখানে, রাতবিরেতে স্বদেশী ডাকাতিও নেই। এমন কি, ইস্কুলের প্রাইজ বিতরণসভায় এবারও 'রুল ব্রিটানিয়া' আবৃত্তি করে সতীশ বাঁড়ুজ্যের নাতনী বাহবা পেয়েছে সদরালা ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে! হ্যাঁ, অন্য কোথাও না হোক, মুচকুন্দপুর থানার চতুঃসীমায় ব্রিটিশ সিংহের এখনো পরিপূর্ণ প্রতিপত্তি।

তা হলে? কে করলে এ কাজ?

দারোগা তখন সারা থানাটা চক্কোর দিয়ে ফিরছেন, কুকুরের মাথায় মুগুর মারলে, পড়ে-যাবার-আগে সে যেমন চক্কোর দেয় খানিকটা, ঠিক সেইরকম ভাবে। একবার ঘরে, একবার বাইরে। ঐ ভুঁড়িওয়ালা দেহ নিয়ে ছুটতে ছুটতে একবার কোয়ার্টারও ঘুরে এসেছেন, গিন্নীকে আশ্বস্ত করবার জন্য। গিন্নীকে আশ্বাস দেওয়ার পরে আর তিলার্ধ দাঁড়ান নি কোয়ার্টারে, আবার ছুটে এসেছেন বাইরে।

কী করবেন দারোগা? আগে ডাইরি লিখবেন? না, আগে প্যারেডে নামিয়ে দেবেন নয়টা কনস্টেবলকে?

ডাইরি ভেবে-চিন্তে লিখতে হবে। কারণ আদালতেও ওটা দাখিল করার দরকার হতে পারে একদিন। কাজেই ওটা এখন থাকুক। প্যারেডটাই আগে হোক। নয়টা কনস্টেবল। সঙ্গে নাজিম রাইটারকেও নামিয়ে দেওয়া যায়। এ.এস.আই.নিকুঞ্জ তদন্তে গিয়েছে একটা চুরির, রাত থাকতেই বেরিয়েছে, এবেলা সে ফিরছে না। তার কাজ অবশ্য মিটতে পারে দুপুরের আগেই, কিন্তু জমিদারবাড়িতে পাঁঠা না-খেয়ে ঘরে ফিরবার ছেলে এ.এস.আই.নিকুঞ্জ নয়। যাকগে, দশজনের একটা ব্যাটালিয়নকে যদি প্যারেডে নামিয়ে দেওয়া যায়, কারও কাঁধে বন্দুক, কারও হাতে রেগুলেশন লাঠি, দেশের লোক হৃদয়ঙ্গম করবে যে দুটো একটা বোমাতে ব্রিটিশ সরকারকে, তথা সন্তোষ দারোগাকে বিচলিত করা যাবে না।

নাজিমকে ডেকে প্যারেডেরই হুকুম দিতে যাচ্ছিলেন সন্তোষবাবু, হঠাৎ তাঁর পিছনে বিনীত কণ্ঠের একটা আওয়াজ শুনলেন–"বড় বাবু!"

"কীরে? কীরে? কী? এই সময়ে এলি দিক্ করতে? বলদ আর কাকে বলে? কী ফুরিয়েছে তোর? খড়? বাখারি? দড়ি? কালই সব কিনে দেয় নি নাজিম? মারব এক চড়–"

বড় বাবু বলে ডেকেছিল ঘোড়াপুকুরের গোপলা নস্কর, তম্বিটাও কাজে কাজেই তারই উপর হচ্ছে। বেলা আটটায় হাজিরা একা দারোগারই নয়, এই খোড়ো ঘরের ঘরামি গোপলারও বটে। ওটাই ওর পেশা। অবশ্য মন্দ লোকে এটাও রটায় (যথা ছিমন্ত মিত্তির) যে ও-পেশা নেহাৎই একটা লোক-দেখানো ব্যাপার, আসল পেশা তার গেরস্তবাড়ির গোলা থেকে ধান পাচার করা।

হ্যাঁ, আটটায় হাজিরা গোপলার। বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ, মাঝে খেয়ে নেবার জন্যও ছুটি একটা ঘণ্টা। মজুরি নগদ আট আনা, আর খেতে অবশ্য গেরস্তই দেবেন। এই শর্তে সর্বত্রই কাজ করে গোপলা, থানাতেও করছে তাই। সরকারী কোয়ার্টারের পিছনে নিজস্ব একখানা চালাঘর আছে সন্তোষবাবুর, তাতে থাকে তাঁর নিজস্ব দু'টি গাই আর একটি বাছুর। নির্জলা দুধ তো দারোগার পক্ষেও দুর্লভ, গাঁয়ে বা বাজারে! ত্যক্ত বিরক্ত দারোগা তাই রেগে মেগে গরু কিনে ফেলেছেন দুটি।

পালা করে তারা দুধ দেয় দারোগাকে । মসৃণ বন্দোবস্ত। বৃন্দাবনের কানুর মতোই, ক্ষীর দই নবনীর অভাব সন্তোষ দারোগার হয় না।

ধমক খাওয়ার পরেও গোপলা যে দারোগার সামনে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে সোজা হয়ে, শুধু গোপলা কেন, মুচকুন্দপুর এলাকার কেউই যে পারে, এটা আজই জানলেন সন্তোষবাবু। জেনে অবাকও যেমন হলেন, আগুনও হয়ে গেলেন তেমনি। চড় মারবার জন্য হাত তুলেছিলেন, এমন সময়ে গোপাল এমন একটি কথা বলল, যাতে উত্তেজিত শ্রীচরণ যেন পক্ষাঘাতে আড়ষ্ট হয়ে ধপ করে পড়ে গেল মাটিতে। গোপাল বলেছে–"কলেজের কয়েকটা ছেলে এসেছে কলকাতা থেকে।"

"এ্যাঁ? কী? কে? কোথায়?"–পর পর প্রশ্নবাণ ছুটছে সন্তোষ হালদারের শ্রীমুখ থেকে।

এবং তার যথাযথ জবাব যত শীঘ্র সম্ভব এবং যতটা সম্ভব গুছিয়ে দিয়েও যাচ্ছে নস্কর গোপলা। আবেগের বশে তার হাতের ছোট কাটারিখানা বনবন করে ঘুরছে দারোগার সমুখে। দারোগাকে পিছু হটতে হলো বার-তিনেক নাক কান বাঁচাবার জন্য। সাধারণতঃ এ-কাটারি চালের বাঁধন কাটবার এবং বাখারি পেটাবার জন্য দরকার হয়।

গোপলার কথা আদ্ধেক শেষ হওয়ার আগেই প্যারেড ডাকবার কথা বিলকুল ভুলে গিয়েছেন দারোগা, তার বদলে সাইকেল বার করবার হুকুম দিয়েছেন চটপট এবং তৈরী হতে বলেছেন নয়জনের মধ্যে সাত জন কনস্টেবলকে। নিজে একবারটি থানাঘরে ঢুকলেন, শুধু রিভলবারটি নেবার জন্য। নাজিমের কানে কানে কী যে বললেন, অন্যেপরে কা কথা, নাজিম নিজেও বুঝল না। না-বুঝেও মাথা নাড়ল, কারণ অতীত অভিজ্ঞতা থেকে সে জানে, এসময়ে প্রশ্ন করে কিছু জানতে বা বুঝতে চাইলে দারোগা রেগে যাবেন তার উপরে।

থানায় দারোগার সাইকেল ছাড়াও আরও সাইকেল চারখানা আছে। দারোগা চাপলেন নিজের মেশিনে, সাত কনেস্টবল আর গোপলা নস্করে মিলে চেপে বসল অন্য চারখানাতে, বনবন করে চলে গেল গোপলার নির্দেশমত। সাইকেল বাহিনীকে ছুটতে দেখে রাস্তার দুই ধারের সব বাড়িতে দরোজার পরে দরোজা বন্ধ হয়ে গেল দড়াম দড়াম শব্দে। বাচ্চাকাচ্চা ঝি-বৌদের বাড়ির পিছন দিকে বাগানের ভিতর গিয়ে লুকোবার নির্দেশ দিয়ে মালিকেরা বলির পাঁঠার মতো কাঁপতে লাগলেন ঘরে বসে।

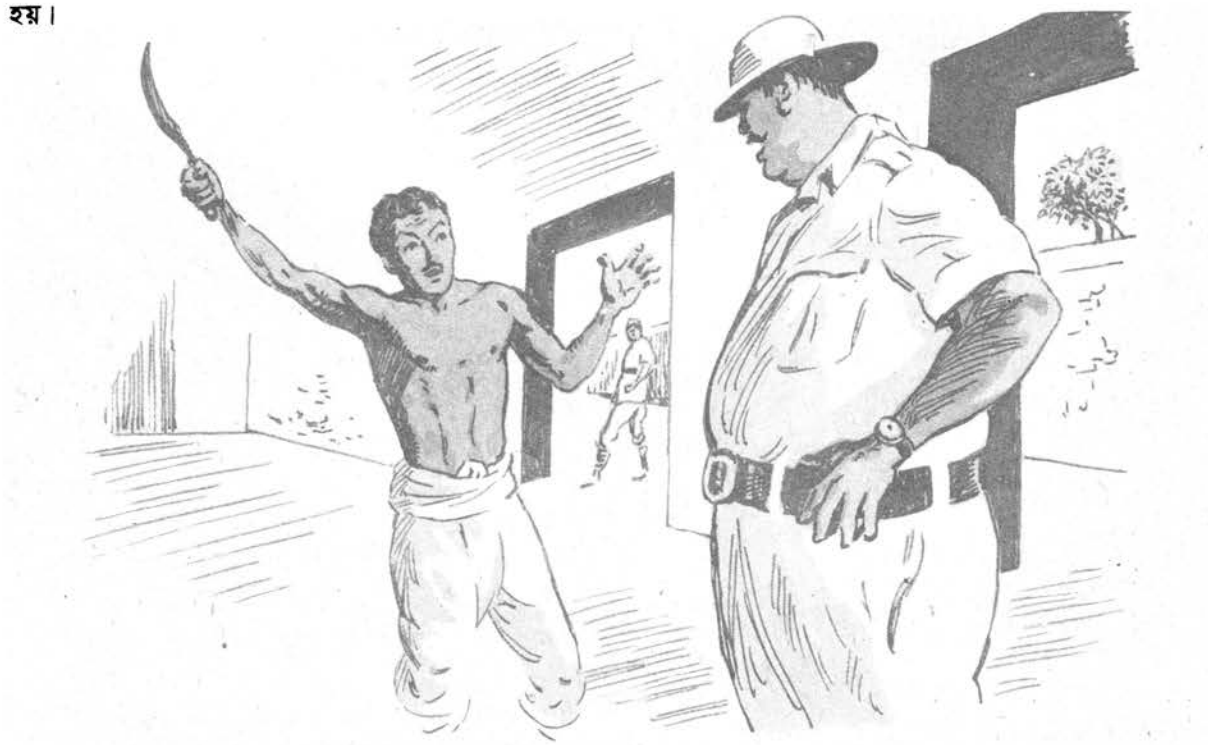

কলেজের কয়েকটা ছেলে এসেছে কলকাতা থেকে

কোথায় বোমা ? ফাঁকা গুহা পড়ে আছে

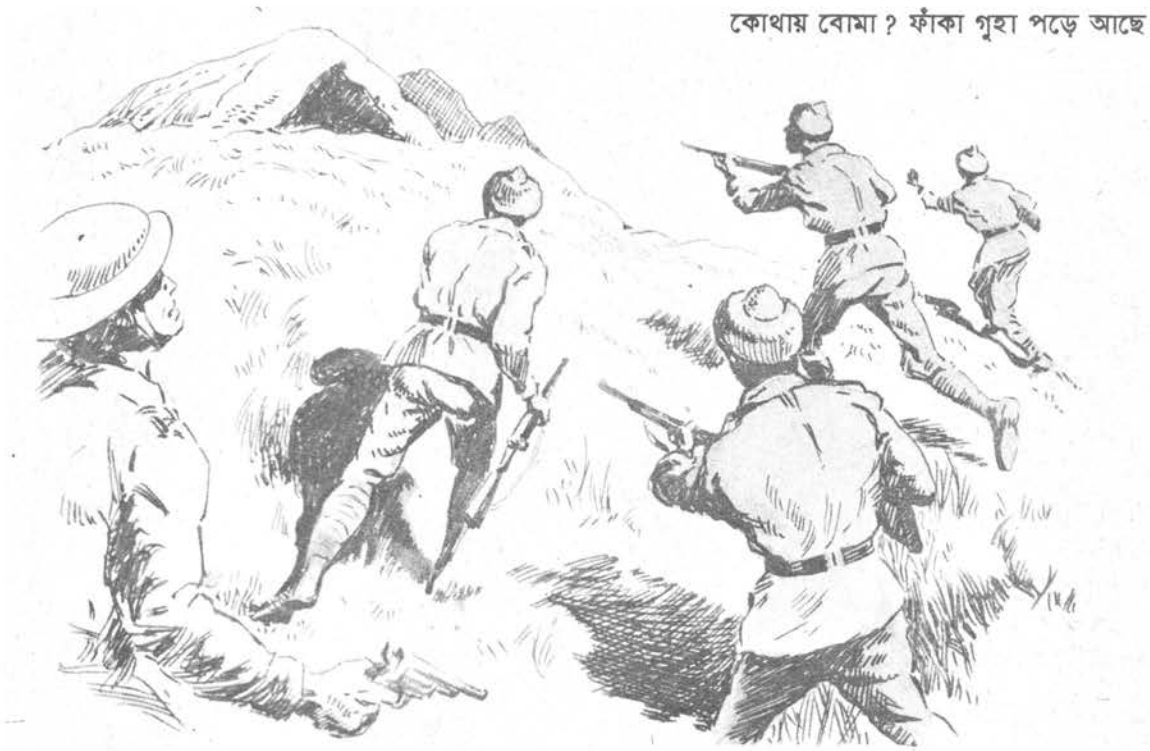

তা, অহেতুক তাঁদের ভয়। তাঁদের কাউকে দরকার নয় সন্তোষ দারোগার, দরকার শুধু সেন পাড়ার বড়-কত্তাকে। তাঁর ছেলে নাকি পরশু কলকাতা থেকে বাড়ি এসেছে, তিনজন সমবয়সী বন্ধুকে নিয়ে ? দরকার প্রথমে সেই ছেলেগুলিকে, এবং তারপর হয়ত খোদ নিখিল সেন অর্থাৎ বড়কত্তাকে। ধনে মানে, এমন কি বয়সেও, পাড়ার অন্য সবাইয়ের চাইতে বড় বলে সর্বসাধারণ গ্রামবাসীই তাঁকে ডাকে ঐ বড়কত্তা বলে।

যাঃ, পাখি উড়েছে। তারা কেউ নেই। মন্মথ এবং তার তিন বন্ধু আজ সকালেই ফিরে গিয়েছে কলকাতায়। বড়-কত্তা মনে মনে যথেষ্টই ভয় পেয়েছেন। নিজের জন্য তত নয়, যতটা ছেলের জন্য। তবে মনে মনে ভয় পেলেও বাইরে তিনি তা প্রকাশ করতে রাজী নন। দারোগার সঙ্গে কথা কইলেন তিনি সমানে সমানে।

কথা এই, বাড়িতে কাল অন্নপ্রাশন ছিল বড়কত্তার বড় নাতির অর্থাৎ মন্মথর বড়দার প্রথম সন্তানের। মন্মথকে লেখা হয়েছিল, সম্ভব হলে সে যেন বাড়ি আসে ঐ উপলক্ষে, একটা দিনের জন্য। এই তো কাছেপিঠেই, ষাট মাইলের পথ মোটে, লোকাল ট্রেনে তিন ঘন্টাও লাগে না।

তা সে এসেছিল। পরশু সন্ধ্যায়। আজ ভোরেই ফিরে গিয়েছে কলকাতার হোস্টেলে। বন্ধু ? হ্যাঁ, তিন বন্ধু এসেছিল তার। চমৎকার তিনটি ছেলে, সুজিত, চন্দন, সন্দীপন। অবশ্যই চলে গিয়েছে তারাও। মন্মথ চলে গেল, তারা বসে থাকবে কোন সুবাদে ?

সব লিখে নিয়ে, অনেক রকম জেরা করে, তারপর বাড়িটা খানা-তল্লাশী করলেন দারোগা। নিয়ে যাওয়ার মতো কিছুই দেখতে পেলেন না। তারপর কী আর করেন, মন্মথর দাদা হেমন্তকে সঙ্গে নিয়ে গেলেন থানা পর্যন্ত। দড়ি বেঁধে নয়। নিজের সাইকেলেই গেল হেমন্ত। যদিও কনেস্টবলরা এমন একখানা ভাব দেখাতে ছাড়ল না, যাতে গ্রামবাসীদের সন্দেহ হতে পারে যে হেমন্তকে বুঝি বা গ্রেফতারই করল পুলিশ।

নিয়ে গেল হেমন্তকে, কাজেই বড়কত্তাকেও যেতে হলো পিছু পিছু। তাঁর তো সাইকেলে চড়া অভ্যাস নেই, তিনি চললেন বাড়ির গরুর গাড়িতে, যেটা কাজে লাগে সাধারণতঃ, মাঠ থেকে ফসল বাড়িতে আনা, বা বাড়ি থেকে গোবর-পচা সার মাঠে নিয়ে যাওয়ার জন্য।

যা হোক, থানা পর্যন্ত আর যেতে হয় নি বড়কত্তাকে। আদ্ধেক পথ যেতে না-যেতেই দেখলেন, হেমন্ত ফিরে আসছে সাইকেলে। দারোগা একটা মুচলেকা সই করিয়ে

নিয়েছেন তাকে দিয়ে, একদিন বাদে একদিন সে গিয়ে থানায় হাজিরা দিয়ে আসবে। উদ্দেশ্য? দারোগা বলেই দিয়েছেন, উদ্দেশ্য—মন্মথর কোনো খবর বাড়িতে এলো কিনা, সেইটি হেমন্তর কাছ থেকে খবর পাওয়া। দারোগার যে পুরো সন্দেহ মন্মথদের উপরে, একথা তিনি গোপন করেন নি। গ্রামে নেমন্তন্ন খেতে এসে থানায় টাইমবোমা লুকিয়ে রেখে যাওয়া!

তদন্তে কী জেনেছে পুলিশ, তা সেনবাড়ির কেউ জানে না। অর্থাৎ থানা থেকে কোনো খবর সেনবাড়িতে দেওয়া হয় নি। কিন্তু থানা থেকে না-আসুক, কলকাতা থেকে এসেছে খবর। রীতিমত সাংঘাতিক খবরই। মন্মথরা কলকাতায় গিয়েছিল ঠিকই, হোস্টেলে স্নানাহার করে, কলেজে যাওয়ার জন্যই বেরিয়েছিল হয়ত। কিন্তু চার বন্ধুর একজনও ফেরে নি আর। হোস্টেল কর্তৃপক্ষ এদিকে জানিয়েছেন অভিভাবকদের, ওদিকে জানিয়েছেন পুলিশকে।

তাদের এই অন্তর্ধানে সেনবাড়িতো দুশ্চিন্তায় মুহ্যমান বটেই, দারোগা সন্তোষ হালদার উত্তেজনায় প্রায় উন্মত্ত, এবং গোপলা নস্কর রাতারাতি এ-অঞ্চলে মান্যগণ্য ব্যক্তির পর্যায়ে উন্নীত। সে বেশ আছে।

বেশ আছে মন্মথরাও। চার বন্ধু নিজেদের হোস্টেলের ঘরে বোমা বানিয়েছিল। সে-বোমা আসল জিনিসে দাঁড়িয়েছে কিনা, তারই পরীক্ষা তারা করতে চেয়েছিল, মৃচকুন্দপুরের দারোগা সন্তোষ হালদারের উপর দিয়ে। লোকটার উপরে ব্যক্তিগত আক্রোশ তাদের যে ছিল কিছু, তা নয়। তবে ওর সম্বন্ধে মন্মথর একটা ছিল প্রবল আপত্তি, পুলিশের লোক হয়ে ও ভুঁড়ি বানাতে গেল কেন!

যা হোক, সন্তোষ মরেন নি। কিন্তু বোমা তাদের আসল চীজেই যে পরিণত হয়েছে, এ-খবর পেয়েই মন্মথরা উল্লসিত। না মরুক সন্তোষ, আরও এমন ঢের লোক আছে, যাদের যমদ্বারে পাঠানো আরও ঢের জরুরী। এবার সেই কাজে লেগে যাও।

একেবারে হিমালয় পর্বতে পাড়ি দিলে চার বন্ধু। ছোট রেললাইনে চুনভাটি একটা ছোট স্টেশন। সেখান থেকে পায়ে হেঁটে মাইল দশেক চলে যাও একটা নির্দিষ্ট পথ বেয়ে, সন্ত্রাসবাদীদের একটা গোপন কারখানা পাবে পাহাড়-ঘেরা এক গভীর উপত্যকায়। মুক্তিতোরণ নাম সে-স্থানের। বোমা যারা তৈরি করতে জানে, তৈরি করতে চায় জীবন বিপন্ন করে, বিপ্লবী নেতারা তাদের জমায়েত করেন সেখানে। আপ্রাণ খেটে বোমার পাহাড় বানিয়ে ফেলুক তারা সেখানে, সে-সব বোমা বাইরের চাহিদা-অনুযায়ী লোকালয়ে আনিয়ে নেবেন নেতারাই। মন্মথরা কাজে লেগে গেল প্রাণমন সর্বস্ব উৎসর্গ করে।

এদিকে পুলিশ নিষ্ক্রিয় নেই। গোপাল নস্করের মতো মানুষ দেশের সর্বত্রই তো আছে! গুপ্তচরেরাই একদা পুলিশের দরবারে খবর এনে দিল, কোথায় আছে মন্মথরা, কী করছে তারা।

অতঃপর সংগোপনে তৈরি হতে লাগল পুলিশ। একটা গোটা পল্টন সেজে বেরুলো সন্ত্রাসীদের গোপন কর্মশালা ধ্বংস করবার জন্য।

এ-অভিযানের খবর পেয়েছে কর্মশালার কর্মীরাও। তারাও সংখ্যায় প্রায় পঞ্চাশ জন। তারা জনে জনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ। পুলিশ যদি আসেই, তারাও ফিরবে না কেউ। মুক্তিযোদ্ধাদের যদি মরতেই হয়, মেরেই মরবে তারা। আততায়ীদের নিশ্চিহ্ন করে তারপর মরবে।

পুলিশ এলো। বিজয়গর্বে প্রবেশ করল মুক্তিতোরণের উপত্যকায়। দু'টো চারটে রাইফেলের গুলির, দুটো চারটে বিচ্ছিন্ন বোমার জন্য প্রস্তুত ছিলই তারা। কিন্তু ঘটনা যা ঘটল, তার জন্য তৈরি থাকা তো দূরের কথা, তার কথা স্বপ্নেও তারা ভাবে নি কখনো।

উপত্যকার মাঝখানে একটা গম্বুজের আকারের পাহাড়। ভিতরে তার প্রশস্ত গুহা একটা। সেইটাই কর্মশালা বোমারুদের।

বোমা? কোথায় বোমা? ফাঁকা গুহা পড়ে আছে, তার চার দেয়ালের গায়ে গায়ে গুটোনো কম্বল, সামান্য তৈজসপত্র। সন্ত্রাসীরা থাকে এখানে, তা বোঝা যাচ্ছে। কিন্তু কোথায় তারা? আর কোথায় তাদের বোমার পাহাড়?

উত্তর পেলো তারা। যখন পুলিশ ব্যাটালিয়নটা সবই ঢুকে পড়েছে গুহার ভিতরে, প্রলয়ংকর একটা আওয়াজে হিমালয় পর্বতটাই যেন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। গুহার মেজে ফাঁক হয়ে গেল চোখের পলকে। নীচে থেকে আগুন উঠল-বিকট শব্দে, লেলিহান শিখা মেলে।

গুহার নিচে, মাটির তলায় ছিল বোমার ভাণ্ডার। সেইখানে আগুন লাগিয়েছে সন্ত্রাসীরা। সমস্ত পুলিশ, সমস্ত সন্ত্রাসী এক সাথে এক বিশাল চিতায় পুড়ে মরল সেইখানে।

ছবিঃ প্রসাদ রায়

জলদস্যুর ছেলে

রবিদাস সাহারায়

ছেলেবেলা থেকেই ডিসমন্ড ছিল দুর্দান্ত স্বভাবের। জাহাজে চড়ে ঘুরে বেড়াতে ভালবাসত। সে হয়ে উঠেছিল একজন সাহসী যোদ্ধা ও অভিজ্ঞ নাবিক। কিন্তু বয়স বাড়তেই তার পরিচয় হলো জলদস্যু হিসাবে। 'উইলো' জাহাজের দক্ষ ক্যাপটেন হিসাবে তার সুখ্যাতি থাকলেও তার জাহাজটি ছিল খুবই কুখ্যাত। সমুদ্রের বুকে উইলো জাহাজ দেখলেই অন্য জাহাজের যাত্রী ও নাবিকদের বুক কেঁপে উঠত।

ডিসমন্ড কেন হলো জলদস্যু? সেই স্মৃতি তার কাছেও ছিল বড় মর্মান্তিক ও রোমহর্ষক।

একদিন সে জাহাজ নিয়ে বেরিয়েছিল সমুদ্রভ্রমণে। সংগে ছিল তার স্ত্রী ও একমাত্র শিশুপুত্র। ভ্রমণ শেষ করে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ একদল জলদস্যু দ্বারা তার জাহাজ আক্রান্ত হলো। জলদস্যুরা যখন দেখল জাহাজে কোনো ধনরত্ন নেই তখন তারা জাহাজটাকেই দখল করে নিল। দস্যুরা নাবিকদের হত্যা করে ফেলে দিয়েছিল জলে। তবে তাকে আর তার স্ত্রীপুত্রকে হত্যা করেনি। একটি লাইফবোটে চাপিয়ে সমুদ্রে ভাসিয়ে দিয়েছিল। তার কিছুক্ষণ পরেই উঠেছিল ঝড়। তীরের কাছাকাছি এসেও সেই ঝড়ে লাইফবোটটি উলটে গিয়েছিল। সে আর তার স্ত্রী বেঁচে গিয়েছিল, কিন্তু ছেলেকে আর বাঁচাতে পারে নি।

সেই দুঃখে ও অভিমানে ডিসমন্ড হয়ে উঠল একজন জলদস্যু-বিদ্বেষী। সে দল গঠন করল, যোগাড় করল জাহাজ। তারপর নেমে পড়ল সাগরের বুকে। জলদস্যুদের জাহাজ দেখলেই সে আক্রমণ করত। জলদস্যুদের হত্যা করে ফেলে দিত জলে। তবে নিরীহ নাবিকদের হত্যা করত না। একদিন একটি জলদস্যুর জাহাজেই সে পেয়ে গেল অনেক ধনরত্ন। সেদিনই সেই জাহাজটি জিব্রাল্টার বন্দরগামী একটি বাণিজ্য জাহাজ

লুট করে স্বদেশে ফিরে যাচ্ছিল।

ধনরত্নের লোভই ডিসমন্ডকে পরবর্তীকালে জলদস্যুতে পরিণত করল। জাহাজের পর জাহাজ আক্রমণ করে অনেক ধনরত্ন আহরণ করতে লাগল ডিসমন্ড। তবু তার লুণ্ঠনের নেশার নিবৃত্তি হলো না।

কিন্তু ভাগ্যলক্ষ্মী বুঝি তার ওপর বিরূপ হয়ে উঠলেন। একদিন একটি জাহাজ আক্রমণ করতে গিয়ে প্রচন্ড লড়াই হলো, বিধ্বস্ত হলো তার জাহাজ। সেই বিধ্বস্ত জাহাজ নিয়ে ডিসমন্ড কোনরকমে ফ্রান্সের উপকূলে এসে পৌঁছল।

বিস্কে উপসাগরের এক খাঁড়ির ভেতর ছিল পোর্টল্যান্ড ডক–জাহাজ মেরামতের কারখানা। সেখানে অনেক জাহাজ আশ্রয় নিয়েছিল। ডিসমন্ডের উইলো জাহাজটিকেও মেরামতের উদ্দেশ্যে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো।

ডক থেকে জানান হলো, জাহাজটিকে মেরামত করতে অন্তত: একমাস সময় লেগে যাবে। তা শুনে ডিসমন্ডের মন খারাপ হয়ে গেল। একটি মাস তাকে বেকার বসে থাকতে হবে!

সহসা তার মাথায় একটি বুদ্ধির উদয় হলো। এভারগ্রীন নামে একটি জাহাজ ছিল সেই ডকে। তার ক্যাপটেন ব্রুটাসের সংগে ডিসমন্ড খুব আলাপ জমিয়ে ফেলল। এভারগ্রীন জাহাজ মেরামত হয়ে গেছে তবে ছাড়বে আরও চার-পাঁচ দিন পরে। কারণ নাবিকরা ছুটি নিয়ে দেশে গেছে, ক্যাপটেনের ছেলেও গেছে দেশে। ব্রুটাস তাঁর ছেলে জ্যাককেও দক্ষ নাবিক করে তোলবার জন্য নিজের কাছে রেখেছেন। তারা ফিরে এলেই জাহাজ গন্তব্যস্থানে যাত্রা করবে।

এভারগ্রীন জাহাজের ক্যাপটেনকে লোভ দেখাল ডিসমন্ড। বলল আসুন, দু-তিন দিনের জন্য ঘুরে আসা যাক মাঝদরিয়ায়। একদিনের লুটপাটে যা লাভ হবে তা এক বছরেও রোজগার করা যাবে না।

ক্যাপটেন ব্রুটাস প্রথমে বুঝতে পারলেন না ব্যাপারটা। কৌতূহল নিয়ে ডিসমন্ডের দিকে তাকালেন। ডিসমন্ড বুঝিয়ে দিল, ইংরেজ, ওলন্দাজ, পর্তুগীজ–তাদের মধ্যে অনেক নাবিকই এখন জলদস্যু। এখন অনেক দেশের লোকের কাছেই এটা লাভজনক এবং সম্ভ্রান্ত জীবিকা।

ডিসমন্ডের কথায় প্রলুব্ধ হলেন ব্রুটাস। সেদিন রাত্রেই এভারগ্রীন জাহাজ ডক ছেড়ে চলে গেল। জাহাজের তিনজন নাবিক আর একজন রসুয়ে মাত্র ছিল ব্রুটাসের সংগী। তারা জাহাজেই রইল, তাদের সংগে যোগ দিল ডিসমন্ডের দলবল।

জিব্রাল্টারের পশ্চিমে আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছেই তারা পেয়ে গেল স্পেনিয়ার্ডদের এক মালবাহী জাহাজ। সেটাকেই আক্রমণ করল ডিসমন্ড। কিন্তু ব্রুটাস নিজে স্পেনের অধিবাসী তাই ডিসমন্ডকে স্পেনীয় জাহাজ আক্রমণ করতে নিষেধ করলেন।

কিন্তু সে কথায় কর্ণপাত করল না ডিসমন্ড। বলল, অত বিচার করলে চলে না ব্রুটাস। আমি নিজেও তো স্পেনের অধিবাসী। কিন্তু আমাকে কি আমার দেশের জলদস্যুরা ক্ষমা করেছিল?

রাত্রের অন্ধকারে সেই মালবাহী জাহাজ আক্রমণ করল ডিসমন্ড। লুটপাট করে বহু মালপত্র তারা পেয়ে গেল। যে বন্দরে গিয়ে লুণ্ঠিত দ্রব্য জলদস্যুরা বিক্রি করে ডিসমন্ডের তা জানা ছিল। তাই কোনো অসুবিধা হলো না। বিক্রি করে পেয়ে গেল তারা অনেক টাকা। এত টাকা পাবে ডিসমন্ড তা ভাবতে পারে নি।

কিন্তু এত টাকা পেয়েও দুশ্চিন্তা হলো ডিসমন্ডের। স্পেনের জাহাজ লুট করেছে সে কথা যদি প্রকাশ করে দেয় ব্রুটাস? তা হলে বিষম বিপদ হবে।

একদিন রাত্রে সে হত্যা করল ব্রুটাসকে। জাহাজে ব্রুটাসের যে তিনজন নাবিক ছিল তাদেরও হত্যা করল। রসুয়েকেও হত্যা করতে গিয়েছিল। কিন্তু বৃদ্ধ রসুয়ে ডেভিড প্রাণ ভিক্ষা চাইল ডিসমন্ডের কাছে। বলল–আমাকে প্রাণে মারবেন না। বাড়িতে আমার একটি পংগু ছেলে আছে। সে ছাড়া আমার আর কেউ নেই। তাকে একবার দেখতে চাই। আমার প্রাণ বাঁচান, আমি আপনার কেনা গোলাম হয়ে থাকব।

ডিসমন্ডের মনের ভেতর যেন একটা বিদ্যুতের শিহরন খেলে গেল। –তোমার ছেলে আছে। পংগু?

নিরস্ত হলো ডিসমন্ড। ভাবল, এই লোকটির সাহায্যেই হয়ত ভবিষ্যতে নানা ঝামেলা থেকে মুক্ত হতে পারবে। বলল–মনে রেখো, আমি তোমাকে প্রাণে বাঁচালাম। তোমার পংগু ছেলের কথা ভেবেই তোমাকে হত্যা করলাম না।

কৃতজ্ঞতায় মাথা নত করল ডেভিড।

এদিকে নির্দিষ্ট দিনে সেই পোর্টল্যান্ডের ডকে এসে হাজির হলো এভারগ্রীন জাহাজের নাবিকরা। ব্রুটাসের ছেলে জ্যাকও এসে হাজির হলো। তাদের জাহাজটা দেখতে না পেয়ে সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। ডকের

অফিসে খবরাখবর নিয়ে জানতে পারল, উইলো জাহাজের ক্যাপটেন এই জাহাজের ক্যাপটেনকে সংগে নিয়ে কি এক দরকারে তিন দিনের জন্য কোথাও গেছে।

কিন্তু পাঁচ দিন অপেক্ষা করেও যখন এভারগ্রীন জাহাজকে ফিরতে দেখা গেল না তখন সবাই চিন্তিত হয়ে পড়ল। তারা ভাবতে লাগল, উইলো জাহাজের ক্যাপ্টেন কোনো কুমতলবে জাহাজটি নিয়ে গেছে, অথবা গভীর সমুদ্রে জাহাজটি কোনো বিপদে পড়েছে।

জ্যাক তার পিতার জন্য চিন্তিত হয়ে পড়ল। অন্যান্য নাবিকরা জ্যাককে সংগে দিয়ে সেই ডক থেকে একটি জাহাজ সংগ্রহ করে বেরিয়ে পড়ল এভারগ্রীন জাহাজের খোঁজে। সেই সময়ে সমুদ্রপথ বিপদসংকুল ছিল বলে প্রত্যেক নাবিকের সংগে বন্দুক থাকত। সেই বন্দুক তারা সংগে নিয়ে যেতে ভুলল না।

এভারগ্রীন জাহাজের খোঁজ পাওয়া গেল। তখন সেই জাহাজ মাঝসমুদ্রে ভিড়িয়ে সদ্য লুট করা কোনো জাহাজের মালপত্র ও টাকাপয়সা ভাগাভাগি করছিল নাবিকরা।

জ্যাক ও তার সংগীরা এগিয়ে গেল। জ্যাক জানে তার পিতা আছে এভারগ্রীন জাহাজে। কিন্তু সেই জাহাজের পাশে যেতেই এভারগ্রীন জাহাজের অপরিচিত নাবিক-দস্যুরা তাদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে লাগল। লড়াই শুরু হলো দুই দলে। বন্দুক চালানোয় জ্যাক ছিল ওস্তাদ। ওদিকে ডিসমন্ডও বড় যোদ্ধা। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানকার পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠল।

এমন সময় সৌভাগ্যক্রমে স্পেনের একটি সামরিক জাহাজ হাজির হলো সেখানে। জ্যাক সামরিক জাহাজের সাহায্য প্রার্থনা করল। সামরিক জাহাজের সংগে মিলিত হয়ে জ্যাকের জাহাজ সহজেই ডিসমন্ডের দলকে কাবু করে ফেলল।

ডিসমন্ড বন্দী হলো। এভারগ্রীন জাহাজ ছিনতাই করার অপরাধে অভিযুক্ত হলো ডিসমন্ড। তা ছাড়াও এভারগ্রীনের ক্যাপটেন ব্রুটাসকে হত্যা করার অভিযোগ তার ওপর আনা হলো।

স্পেনের আদালতে বিচার শুরু হলো।

জ্যাক দাবি করল ক্যাপটেন ব্রুটাসের পুত্র হিসাবে

রাতের অন্ধকারে সেই মালবাহী জাহাজ আক্রমণ করল ডিসমন্ড।

নিভৃতে কথাবার্তা হলো ডেভিড ও ডিসমন্ডের মধ্যে।

এভারগ্রীন জাহাজের সে-ই মালিক। কিন্তু চতুর ডিসমন্ড উলটে জ্যাকের ওপরেই সমস্ত দোষ চাপিয়ে দিল। সে অভিযোগ করল জ্যাকই তাকে এভারগ্রীন জাহাজ দিয়ে জলদস্যুতার কাজে নিযুক্ত করেছে। সে প্রচার করল, জ্যাক ইংলন্ডের গুপ্তচর।

সেই সময়ে স্পেনের সঙ্গে ইংলন্ডের খুব রাজনৈতিক গোলযোগ ও তিক্ততা চলছিল। চতুর ডিসমন্ড সেই সুযোগ নিয়েই এই অপবাদ প্রচার করল।

স্পেনের রাজা দ্বিতীয় ফিলিপ বিচারকদের প্রতি জ্যাকের ওপর সতর্ক দৃষ্টি রাখবার নির্দেশ দিলেন।

জ্যাকের সঙ্গী নাবিকরা সাক্ষ্য দিল–স্পেনবাসী ব্রুটাসের ছেলে, কাজেই স্পেনের লোক হয়ে সে ইংলন্ডের গুপ্তচর বৃত্তি করতে পারে না। ডিসমন্ড এইবার খুবই মুশকিলে পড়ে গেল। ভাবল, এই সময়ে এভারগ্রীন জাহাজের বৃদ্ধ রসুয়ে ডেভিড হয়ত তাকে কোনো প্রকারে সাহায্য করতে পারে। তাই ডিসমন্ড জাহাজের একমাত্র জীবিত বৃদ্ধ ডেভিডের সঙ্গে দেখা করার অনুমতি প্রার্থনা করল। বিচারক অনুমতি দিলেন। নিভৃতে কথাবার্তা হলো ডেভিড ও ডিসমন্ডের মধ্যে। ডিসমন্ড কাতর প্রার্থনা করল বৃদ্ধ রসুয়েকে–আমি যেমন তোমার জীবন বাঁচিয়েছি, তুমিও আমাকে বাঁচাও।

ডেভিড বলল, আমি কি ভাবে বাঁচাবো আপনাকে? তবে আমি যা জানি সেটাই বলতে পারি। জ্যাককে ক্যাপটেন ব্রুটাসের ছেলে বলে জানলেও সে ব্রুটাসের পুত্র নয়, তার পালিত পুত্র। জ্যাক নিজেও তা জানে না।

অন্ধকারের মধ্যেও আলোর রেখা দেখতে পেল ডিসমন্ড। সে উৎসাহিত হয়ে বলল, তা হলেই হবে। তুমি সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে সে কথা বলে দাও। তবেই জ্যাককে ইংলন্ডের ছেলে বলে প্রমাণ করতে আমার অসুবিধা হবে না। তখন অনায়াসেই তাকে ইংলন্ডের গুপ্তচর বলে প্রমাণিত করা যাবে।

সাক্ষীর কাঠগড়ায় দাঁড়াল বৃদ্ধ রসুয়ে। সে বলল–ধর্মাবতার, জ্যাক ব্রুটাসের ছেলে নয়। ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রের জলে ভেসে যাচ্ছিল এই ছেলেটি। সমুদ্রে মাছ ধরার জেলেরা মাছ ধরার সময় তাকে কুড়িয়ে পায়। তারা তাকে বাঁচিয়ে তোলে। ব্রুটাসের কোনো সন্তান ছিল না। ব্রুটাস খবর পেয়ে সেই ছেলেটিকে নিয়ে লালন-পালন করতে থাকেন। আমি সেই খবর জানি।

বিচারক জিজ্ঞেস করলেন–কবে এই ছেলেটিকে জেলেরা কুড়িয়ে পেয়েছিল?

–ধর্মাবতার, ১৫৬৮ সালের মাঝামাঝি কোনো সময়ে। তখন এই ছেলেটির বয়স ছিল দু'তিন বছর।

বিচারক হিসাব করে দেখলেন, এটা ১৫৮৮ সাল। ছেলেটির বয়স এখন একুশ বাইশ বছর। বৃদ্ধ রসুয়ের কথা মিথ্যা নয়।

বিচারক রসুয়ের কথার সত্যতা বিচার করার জন্য আবার জিজ্ঞেস করলেন–কত সালে বলছ?

বৃদ্ধ ডেভিড জবাব দিল–১৫৬৮ সালের মাঝামাঝি।

সে কথা শুনে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে কেঁপে উঠল দুর্দান্ত জলদস্যু ডিসমন্ড। ১৫৬৮ সালের মাঝামাঝি? তখন তো তারই জাহাজ আক্রান্ত হয়েছিল। লাইফবোটে ভাসতে ভাসতে তারা পড়েছিল ঝড়ের মুখে। সে আর তার স্ত্রী রক্ষা পেয়েছিল, কিন্তু ছেলেকে আর খুঁজে পায় নি। ঘটনা অনুযায়ী এই ছেলেটিই তার হারানো ছেলে হওয়া সম্ভব। বেঁচে থাকলে তাঁর ছেলেও ঠিক এত বড়ই হত। আর এই জ্যাকের চেহারার মধ্যেও যেন রয়েছে তার স্ত্রীর মুখের আদল। এ যে তারই ছেলে।

বিচারকক্ষেই চিৎকার করে উঠল ডিসমন্ড–এ যে আমার ছেলে, ধর্মাবতার, এ ছেলে আমার।

কৌঁসলিরা স্তম্ভিত। বিচারক স্তম্ভিত। যাকে শাস্তি দেবার জন্য, ফাঁসির কাঠে তুলবার জন্য ডিসমন্ড লালায়িত–সে আবার তাকেই নিজের ছেলে বলে দাবি করছে। কী আশ্চর্য ব্যাপার।

ডিসমন্ড বলল–এর আগে আদালতে যা বলেছি তা সব মিথ্যা। আমিই আমার ছেলের পালক ক্যাপটেন ব্রুটাসকে হত্যা করেছি। তার জাহাজ আমিই লুঠ করেছি।

বিচারে ডিসমন্ড দোষী প্রমাণিত হলো। জুরিরা অভিমত প্রকাশ করলেন–ডিসমন্ডকে ফাঁসি দেওয়া হোক।

ডিসমন্ড বলল–আমি জীবনের ওপর ও জলদস্যুদের ওপর বিরক্ত হয়েই এই ঘৃণিত পথ বেছে নিয়েছিলাম। কিন্তু আমি আমার ছেলেকে ফিরে পেয়েছি। পেয়েছি সংসারের সুখের সন্ধান। আমি ঈশ্বরের নামে শপথ করে বলছি, আমি আর কোনোদিন দস্যুতা করব না। আমাকে সুস্থভাবে শান্তিতে বাঁচতে দিন। ধর্মাবতারের প্রতি আমার এই প্রার্থনা।

কিন্তু আইনের বিধান থেকে ডিসমন্ড মুক্তি পেল না। জ্যাককে মুক্তি দেওয়া হলো। ডিসমন্ডের প্রতি হলো মৃত্যুদণ্ডের আদেশ।

ডিসমন্ড সম্রাট ফিলিপের কাছে জীবন ভিক্ষার আবেদন করল। সেই সঙ্গে জ্যাকও পিতার মৃত্যুদণ্ডের আদেশ রদ করার প্রার্থনা জানাল। সম্রাট বিবেচনা করলেন। ডিসমন্ডের মৃত্যুদণ্ডের বদলে হলো আজীবন কারাদণ্ড।

জ্যাক হতভম্ব, বিভ্রান্ত। পালক পিতাকে হারিয়ে সত্যিকার পিতাকে পেয়েও আজ সে বঞ্চিত। অদৃষ্টের কী নির্মম পরিহাস!

কিছুদিন পরেই সম্রাট একটি হুকুমনামা জারি করলেন। শীঘ্রই আর্মাডা নিয়ে ইংলণ্ডে অভিযান করা হবে। যে সব বন্দী যোদ্ধা স্পেনের পক্ষ হয়ে সেই অভিযানে যোগ দিতে চায় তাদের দেওয়া হবে শর্তাধীনে মুক্তি।

ডিসমন্ড সেই শর্তে রাজী হলো। চুক্তিতে স্বাক্ষর করার পরই এল তার মুক্তির আদেশ। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে নির্দেশ এল, মুক্তিলাভ করেই কারাগার থেকে তাকে সৈন্য শিবিরে চলে যেতে হবে।

জ্যাক এই আনন্দ ও হতাশার মধ্যেই যেন একটি আলোর পথ খুঁজে পেল। সে সম্রাটের কাছে আবেদন জানাল–পিতার বদলে আমিই যাব আর্মাডা অভিযানে। পিতা বয়সে প্রৌঢ়, তাঁর চেয়ে আমিই সৈনিক হিসাবে উপযুক্ত। আমার পিতাকে রেহাই দিন।

সম্রাট সম্মতি দিলেন। কিন্তু ডিসমন্ড ভয়ানক মুষড়ে পড়ল। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল–তুই একি করলি জ্যাক? নিজেকে কেন এমন করে মরণের পথে ঠেলে দিলি? তোকে নিয়ে আবার সংসার পাতবো, এই তো ছিল আমার মনের বাসনা। তোর মা যে তোর পথ চেয়ে বসে আছে।

জ্যাক বলল–মায়ের কাছে আমি বিদায় নিয়ে এসেছি বাবা। পিতার দুঃখ লাঘব করা তো সন্তানেরই কর্তব্য। তা ছাড়া আমি স্পেনের সন্তান। মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে যাওয়া তো পরম গৌরবের বিষয়। যুদ্ধ শেষ হলেই বিজয়ীর বেশে আবার ফিরে আসব।

অশ্রুজলে ডিসমন্ড বিদায় দিল জ্যাককে।

এর পরের কাহিনী ইতিহাসের জ্বলন্ত অক্ষরে লেখা আছে। ১৫৮৮ সালে স্পেনের সম্রাট দ্বিতীয় ফিলিপ বিশাল রণতরী বাহিনী আর্মাডাকে ইংলণ্ড আক্রমণ করবার জন্য পাঠালেন। কিন্তু ইংরেজ সেনাবাহিনী সেই আর্মাডাকে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিল। অসংখ্য স্পেনীয় সৈন্য নিহত হলো। জ্যাকও ছিল সেই আত্মদানকারীদের মধ্যে একজন। 'জলদস্যুর ছেলে' এই কলঙ্ক জ্যাক তার মৃত্যু দিয়েই ঘুচিয়ে দিল।

ছবি ঃ সরোজ সরকার

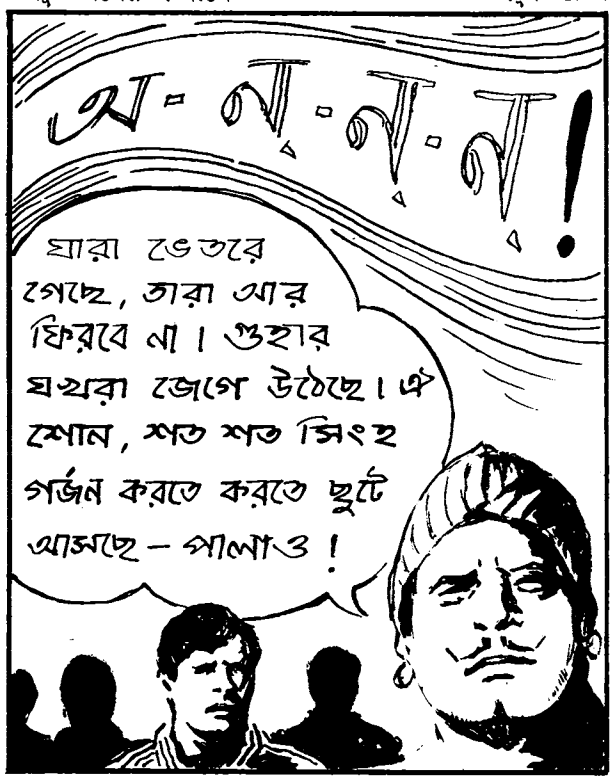
এ-ন-ন-ন!
যারা ভেতরে গেছে, তারা আর ফিরবে না। গুহার যখরা জেগে উঠেছে। ঐ শোন, শত শত সিংহ গর্জন করতে করতে ছুটে আসছে – পালাও!

আমাদের পিছনে পায়ের শব্দ। কারা যেন ছুটে আসছে!

এদিকে এস। এই পাথরটার আড়ালে আমরা লুকিয়ে পড়ি।
a-109

গুহার ভেতর থেকে কারা বেরিয়ে এল?..
ঘটোৎকচ!..

সঙ্গের লোকটা নিশ্চয় মাখনবাবু। কিন্তু ঘটোৎকচ মাথায় কি নিয়ে যাচ্ছে ?...

গুপ্তধন ! কুমার — ঘটোৎকচ গুপ্তধন নিয়ে যাচ্ছে !

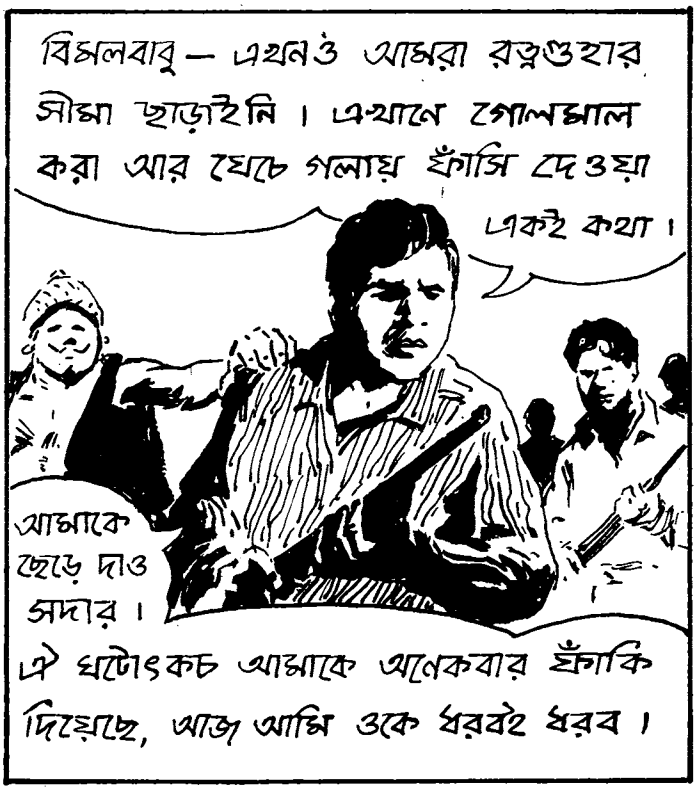
বিমলবাবু — এখনও আমরা রত্নগুহার সীমা ছাড়াইনি। এখানে গোলমাল করা আর ঘেচে গলায় ফাঁসি দেওয়া একই কথা।
আমাকে ছেড়ে দাও সর্দার।
ঐ ঘটোৎকচ আমাকে অনেকবার ফাঁকি দিয়েছে, আজ আমি ওকে ধরবই ধরব।

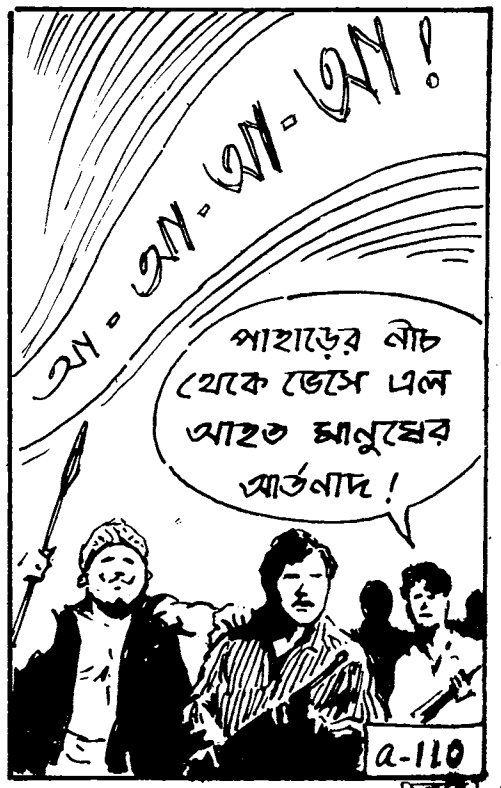
আ-আ-আ-আ !
পাহাড়ের নীচ থেকে ভেসে এল আহত মানুষের আর্তনাদ !
a-110

[চলবে]

একদিনের বিড়ম্বনা

দোলগোবিন্দ মুখোপাধ্যায়

অমর কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র লেখনীর জাদুতে সারা দেশের মানুষকে মোহিত করেছিলেন যেমন, তেমনি বন্ধু-বান্ধব বা স্নেহভাজনদের আড্ডাতেও সুন্দর সুন্দর আকর্ষণীয় গল্প বলে চমৎকৃত করতেন সকলকে। আসর মাতিয়ে রাখতে তাঁর জুড়ি ছিল না।

এ হেন ব্যক্তি সভা-সমিতিকে কিন্তু খুব ভয় পেতেন।

কেন জানি না, যে কোনো কারণেই হোক, সভায় দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দেওয়ার কাজটা তাঁর মোটেই আসত না। এইজন্যে সভা-সমিতির নাম শুনলেই যেমন করে হোক এড়িয়ে চলতেন তিনি। অথচ দেশের নানা প্রান্ত থেকে নানা উৎসব-অনুষ্ঠানে তাঁর ডাক আসত। ক্রমে ক্রমে লোকে জেনে গিয়েছিল, শরৎচন্দ্রকে কোনো সভায় বা অনুষ্ঠানে আনতে গেলে একরকম জোর-জবরদস্তি করেই আনতে হবে। কাজেই, যতই অনিচ্ছা থাকুক, কোনো কোনো শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি বা স্নেহভাজনদের চাপে পড়ে তাঁর হাজার অনিচ্ছাও অনেক সময় বলবতী হতো না। ফলে শরৎচন্দ্র নিজে যেমন বিড়ম্বনা ভোগ করতেন, তেমনি অনুষ্ঠান-উদ্যোক্তারাও সময়ে সময়ে বিড়ম্বিত হতেন।

একটা ঘটনার কথা বলি।

বাংলা ১৩৪১ সাল। যশোহর জেলার কালিয়া গ্রামে এক লাইব্রেরি ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষে এক সভার আয়োজন করা হয়েছিল। সেই সভার উদ্যোক্তারা শরৎচন্দ্রকে তাঁদের অনুষ্ঠানে নিয়ে যাবার বাসনায় শরৎচন্দ্রেরই এক ঘনিষ্ঠ ব্যক্তির মাধ্যমে একদিন তাঁকে গিয়ে বিশেষভাবে আমন্ত্রণ জানালেন।

শরৎচন্দ্র প্রথমে তাঁর স্বভাবসুলভ অনিচ্ছা প্রকাশ করলেও শেষ পর্যন্ত চক্ষুলজ্জার খাতিরে রাজী হয়ে গেলেন। শরৎচন্দ্রের সম্মতি পাবার পর উদ্যোক্তারা কেমনভাবে তাঁকে নিয়ে যাবেন সেইসব ব্যবস্থাদি ঠিকঠাক করে খুশি মনে চলে গেলেন কালিয়ায়।

সভার আগের দিন যথারীতি লোক এল কালিয়া থেকে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে যাবার জন্যে। সেইদিনই রাত্রি দশটা নাগাদ ট্রেন। ভদ্রলোক বললেন, সময়মত তৈরি হয়ে থাকবেন, আমি এসে আপনাকে স্টেশনে নিয়ে যাব।

শরৎচন্দ্র বললেন, রাখ দিকিনি ওসব! অনেক দূর থেকে এলে, আগে নাওয়া-খাওয়া কর, তারপর দেখা যাবে এখন। নাই-বা গেলাম!

ভদ্রলোক বললেন, সর্বনাশ! আপনি ওসব কথা মোটেই বলবেন না। আপনাকে নিয়ে না গেলে আমার গ্রামে ঢোকাই বন্ধ হয়ে যাবে তা জানেন?

শরৎচন্দ্র বললেন, আরে বাপু ঠিক আছে। ট্রেন তো সেই রাত্রে। আগে নাওয়া-খাওয়া সার দিকিনি!

আজ্ঞে, আমি খাওয়া-দাওয়া কিছু করব না। বাইরে

অনেক কাজ আছে। আমি এখন যাই, সন্ধ্যা নাগাদ আসব। আপনি তৈরি হয়ে থাকবেন।

–আচ্ছা, ঠিক আছে।

ভদ্রলোক চলে গেলেন। তারপর কাজকর্ম মিটিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ শরৎচন্দ্রের বাড়িতে এসে দেখলেন, শরৎচন্দ্র তৈরি তো হননি, উপরন্তু চোখ বুঁজে আরাম কেদারায় বসে মনের সুখে গড়গড়া টানছেন।

ভদ্রলোককে দেখে অম্লানবদনে বললেন, শরীরটা ভাল নয় হে, যেতে পারব না।

ভদ্রলোক একে সারাদিনই চিন্তায় চিন্তায় কাটিয়েছেন, তার ওপর শরৎচন্দ্রের এই উক্তি শুনে মাথায় যেন তাঁর আকাশ ভেঙে পড়ল।

উপায়ান্তর না দেখে তিনি বললেন, কোনো কথাই আমি আপনার শুনব না। যদি না যান, আপনার বাড়িতে আমি হত্যে দিয়ে পড়ে থাকব।

শরৎচন্দ্র মুহূর্তকাল কি ভাবলেন কে জানে, তারপর বললেন, না গেলেই নয়?

ভদ্রলোক বললেন, কোনো ক্রমেই নয়। আপনাকে না নিয়ে এখান থেকে এক পাও আমি নড়ব না।

–আচ্ছা বস, দুটি খেয়ে নিই।

বলেই ভৃত্য যামিনীকে হাঁক দিয়ে বললেন, ওরে যামিনী, তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নে। আমার সঙ্গে তোকেও যশোরে যেতে হবে।

ভদ্রলোক ইষ্টদেবতার নাম করে দুরু দুরু বক্ষে ট্যাক্সি ডাকতে ছুটলেন।

সে সময় শিয়ালদহ থেকে যশোহর জেলার কালিয়ায় যেতে হলে খুলনা মেলে খুলনা পর্যন্ত যেতে হতো। তারপর খুলনা থেকে স্টীমারে চেপে কালিয়ায়।

ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের জন্যে ট্রেনের ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্ট ঠিক করেছিলেন, আর ভৃত্য যামিনীর জন্যে ফার্স্ট ক্লাস কম্পার্টমেন্টের লাগোয়া সার্ভেন্টস্ কম্পার্টমেন্ট। এবং তিনি নিজে গিয়ে উঠলেন তৃতীয় শ্রেণীর এক কামরায়।

ট্রেন যথাসময়ে ছেড়ে দিল।

তারপর রাত্রি তখন প্রায় দেড়টা, ট্রেন যশোহর স্টেশনে এসে পৌঁছালে তখনকার দিনের নিয়মমতো প্ল্যাটফরম থেকে রেলকর্মচারীরা 'যশোর, যশোর স্টেশন' বলে হাঁকতে লাগল।

ওই হাঁক শুনেই ভৃত্য যামিনী মোটঘাট নিয়ে দুদ্দাড় করে যশোহর স্টেশনে নেমে পড়ল। তারপর জিনিসপত্র গোছগাছ করে ধীরে সুস্থে মুনিবের খোঁজ করতে লাগল।

যেমন করে হোক এর একটা বিহিত করতে হবে।

ট্রেন ইতিমধ্যে ছেড়ে চলে গেছে। স্টেশনও প্রায় ফাঁকা। যামিনীর মুনিবকে কোথাও দেখতে না পেয়ে অচেনা-অজানা জায়গায় অন্ধকার রাত্রে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ল। আসলে যামিনী ভেবেছিল, যশোহরই তাদের গন্তব্যস্থল। কারণ মুনিব তাকে খুলে কিছু বলেন নি। আর এদিকে শরৎচন্দ্র বা সেই ভদ্রলোকও এই ঘটনার বিন্দুবিসর্গও জানতে পারলেন না। যামিনীর কাছে রেলের টিকিটও ছিল না। প্ল্যাটফরমে টিকিট কালেক্টর তার কাছে টিকিট চাইলে সে টিকিট দেখাতে পারল না। টিকিট কালেক্টর তখন যামিনীকে স্টেশন মাস্টারের ঘরে ধরে নিয়ে গেল। যামিনী কাঁদো কাঁদো মুখে জানালে, সে তার মুনিব বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে কলকাতা থেকে আসছে। তার মুনিব আর যে

ভদ্রলোক তাদের সঙ্গে করে আনছিলেন টিকিট তাঁদের কাছে আছে। এ কথা শুনে স্টেশন মাস্টার তল্লাশ করতে লাগলেন, যশোহরে কোনো সাহিত্য-সভা আছে কিনা। আর শরৎচন্দ্রই বা কোথায় এসে উঠলেন!

এদিকে ঠিক সকাল হওয়ার মুখে শরৎচন্দ্রকে নিয়ে খুলনা মেল খুলনা স্টেশনে পৌঁছাল। ভদ্রলোক শরৎচন্দ্রের কামরায় গিয়ে শরৎচন্দ্রকে ডেকে তুললেন। শরৎচন্দ্র ট্রেন থেকে নেমেই বললেন, যামিনীকে ডাক, সে হয়তো নাক ডাকিয়ে এখনো ঘুমুচ্ছে।

ভদ্রলোক সার্ভেন্টস্ কম্পার্টমেন্টে গিয়ে দেখেন কম্পার্টমেন্টে যামিনী নেই। স্টেশনেও কাছে পিঠে কোথাও দেখতে পেলেন না।

শরৎচন্দ্রকে বললেন, আজ্ঞে, তাকে তো কোথাও দেখতে পাচ্ছি না! কম্পার্টমেন্টেও নেই, প্ল্যাটফরমেও পেলাম না।

শরৎচন্দ্র তাই শুনেই আঁতকে উঠে বললেন, সে কী! কোথায় গেল সে? শীগগিরি খুঁজে বের কর তাকে!

–আজ্ঞে, সব জায়গাই তো তন্নতন্ন করে খুঁজলাম–

–সর্বনাশ! কোথায় হারাল সে? বিধবার একমাত্র ছেলে, হারিয়ে গেলে তার মাকে আমি জবাব দেব কী?

ভদ্রলোক তো দারুণ অপ্রস্তুত। এই অবস্থায় তাঁর করণীয়ই বা কী তিনি বুঝতে পারলেন না। কিছু সময় ভেবে নিয়ে তিনি বললেন, আপনি বরং ওয়েটিং রুমে চলুন, একটু বিশ্রাম নিন। আমি স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে যোগাযোগ করে যাহোক একটা ব্যবস্থা করছি।

শরৎচন্দ্র বললেন, যেমন করে হোক, এর একটা বিহিত করতেই হবে। তা না হলে দরিদ্র বিধবাকে গিয়ে আমার মুখ দেখানোর উপায় থাকবে না। এখন বুঝতে পারছি, কী কুক্ষণে যাত্রা শুরু করেছিলাম! ভালোয় ভালোয় বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচি।

শরৎচন্দ্র ওয়েটিং রুমে উদ্বিগ্ন মনে বসে রইলেন। এদিকে ভদ্রলোক স্টেশন মাস্টারকে সব কথা খুলে বলে তাঁর সাহায্য চাইলেন। স্টেশনে স্টেশনে খবর পাঠিয়ে যামিনীর খোঁজ নিতে বললেন। স্টেশন মাস্টার বিখ্যাত সাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের এই বিপদ শুনে আপ্রাণভাবে খবর নেবার চেষ্টা করতে লাগলেন, তাঁর ভত্য মাঝখানের কোনো স্টেশনে নেমে পড়েছে কি না! এই অবসরে ভদ্রলোকটি কালিয়ায় সভার উদ্যোক্তাদেরও এক জরুরী টেলিগ্রাম পাঠালেন, ঘরের কাছে এসে এই বিপদের কথা জানিয়ে।

খুলনার স্টেশন মাস্টারের আন্তরিক চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত যামিনীর খবর পাওয়া গেল। তিনি খবর দিলেন, ভৃত্যটি যশোহর স্টেশনে ভুল করে নেমে পড়েছিল। সেখানে স্টেশন মাস্টারের ঘরে তাঁর হেপাজতে বসে আছে। পরের গাড়িতেই দুপুর নাগাদ যামিনী খুলনায় এসে পড়ছে।

যামিনীর খোঁজ পেয়ে শরৎচন্দ্র স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়লেন। ভদ্রলোকটিকে বললেন, যামিনী এলে পরের ফিরতি গাড়িতেই তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন। কোনো ক্রমেই আর সভায় যাবেন না।

ভদ্রলোকটি পড়লেন দারুণ দুশ্চিন্তায়। শেষ পর্যন্ত তীরে এসে তরী না ডুবে যায়! এদিকে সময়মতো তাঁর কালিয়ায় খবর দেওয়াই ছিল। এখন অনুষ্ঠানের উদ্যোক্তারা এসে পড়লেই তিনি বাঁচেন। মুখে কোনো কথা না বলে তিনি শরৎচন্দ্রের দুপুরের আহারাদির বন্দোবস্ত করতে স্টেশনের বাইরে গেলেন। ঘটনাচক্রে সেখানে তিনি তাঁর এক পরিচিত জনকে পেয়ে গেলেন। তাঁকে সব কথা খুলে বললে সেই ভদ্রলোকটি শরৎচন্দ্রের দুপুরের খাওয়ার ভার নিজে নিলেন। আহারাদির পর শরৎচন্দ্র বিশ্রাম নিতে লাগলেন। তিনি একরকম ঠিকই করে ফেলেছেন, যামিনী এসে পৌঁছালেই হয়, তারপর ভালোয় ভালোয় কলকাতার গাড়িতে চেপে বসবেন।

কিছুক্ষণ পরই যশোহর থেকে যামিনীর গাড়ি এসে পৌঁছাল। যামিনীকে জলজ্যান্ত দেখতে পেয়ে শরৎচন্দ্র হাতে যেন স্বর্গ পেলেন। মুখে হাসি এনে বললেন, ওরে, যা হবার হয়ে গেছে। শীগগিরি এক ছিলিম তামাক সাজ। একটু পরেই কলকাতার গাড়ি, বাড়ি ফিরতে হবে।

শরৎচন্দ্র কলকাতায় ফিরে যাবেন বলে যখন এইরকম স্থিরপ্রতিজ্ঞ হয়ে আছেন, ঠিক তখনই সৌভাগ্যক্রমে কালিয়া থেকে সভার উদ্যোক্তারা দলে দলে এসে হাজির হলেন। শরৎচন্দ্রের কোনো অনুরোধ-উপরোধই আর কাজে লাগল না। অত বড় একটা সভার আয়োজন, যে সভায় শরৎচন্দ্রই মধ্যমণি ও একমাত্র আকর্ষণ, তা তাঁর খেয়ালীপনায় এইভাবে পন্ড হয়ে যাবে! উদ্যোক্তারা একরকম হৈ হৈ করেই শরৎচন্দ্রকে নিয়ে গিয়ে খুলনার স্টীমারঘাটায় তুললেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই স্টীমার যাত্রা করল কালিয়ার উদ্দেশে। মহা বিড়ম্বনার হাত থেকে রেহাই পেলেন সকলে।

ছবি : অলয় ঘোষাল

ছবি, ছড়া আর গল্পে ভরা ছোটদের মনের মত বই

- চোদ্দ পিদিম : গৌরী ধর্মপাল ৬.০০
- তিনটে তামার পয়সা : মীরা বালসুব্রমনিয়ম ৭.০০
- টুনটুনির গল্প : উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী ৩.০০
- জানোয়ার : লীলা মজুমদার ৪.০০
- কুমীর সাহেব : প্রেমেন্দ্র মিত্র ৩.০০
- শ্যামলা দীঘির ঈশান কোণে : শশিভূষণ দাশগুপ্ত ৫.০০
- ছড়ার দেশে টুলটুলি : শৈল চক্রবর্তী ৬.০০
- মজার কবিতা : উপেন্দ্র মল্লিক ৫.০০
- মজার ছড়া : ভবানীপ্রসাদ মজুমদার ৫.০০
- রুবিক ঘনকের সহজ সমাধান : ছবিনাথ মণ্ডল ৬.০০
- খাগড়াই : সুকুমার রায় ৩.৫০

এবং যোগীন্দ্রনাথ সরকারের অমর রচনার কয়েকটি:

- আষাঢ়ে স্বপ্ন ৩.০০
- হাসিখুসি-১ ৩.৫০
- হাসিখুসি-২ ৩.৫০
- হাসিরাশি ৪.৫০
- ডঃ বিজনবিহারী ভট্টাচার্য সম্পাদিত বঙ্কিম উপন্যাসসমগ্র [কিশোর সংস্করণ] ২৫.০০
- জন্মদিনে ও অন্নপ্রাশনে উপহারে আমার শৈশব (শোভন) ৪০.০০ (সাধারণ) ২৫.০০

শিশু সাহিত্য সংসদ প্রাইভেট লিমিটেড

৩২ এ আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড : কলকাতা-৯

: ফোন-৩৫-৭৬৬৯ :

হারায়নি

জগবন্ধু হালদার

হিমঢাকা চটি। হিমালয়ের দুর্গম অঞ্চলে এক তুষারাবৃত স্থানের নাম।

এখানে কোনো গ্রাম বা জনবসতি নেই। পাহাড়ে ঘেরা এটা একটা তুষারধবল বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। ওখানে একটি মাত্র বাড়ি বরফের মাঠের মধ্যে একা দাঁড়িয়ে আছে–সরকারী বাড়ি। পাথর গেঁথে তৈরি। এবড়ো-খেবড়ো দেওয়াল। কখনো কোনো সরকারী লোক এলে কয়েকদিন এখানে থেকে যায়।

তারাও এটাকে হিমঢাকা চটি বলে। সরকারী নথিপত্রেও এটার নাম দেওয়া হয়েছে হিমঢাকা চটি।

কথিত আছে, অতীতে এখানে একটা সরোবর ছিল। সেই সরোবরকেই তীর্থ মানা হতো। তখন তীর্থযাত্রী আসত। তাই একটা চটিও ছিল এখানে। পরে কোনো এক সময়ে গোটা অঞ্চলটা চিরদিনের জন্য তুষারে ঢাকা পড়ে যায়। তারপর সে জলাশয়ের কোনো চিহ্ন নেই। সেই থেকে এ পথে কোনো তীর্থযাত্রী আসে না। সেদিনের সেই চটিও এখন হারিয়ে গেছে। এখনকার হিমঢাকা চটি বলতে ঐ সরকারী রেস্ট হাউস। এটা তৈরি হয়েছে আঠারো বছর আগে।

চীনের সঙ্গে ভারতের যুদ্ধ হওয়ার পর এটার গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। এই বাড়ির একটা অংশ মিলিটারী চৌকিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং সব সময়ের জন্য দু'জন সশস্ত্র জোয়ান সেখানে মোতায়েন থাকে। বাকি অংশটা থাকে রাজবাহাদুর নামে এক কেয়ারটেকারের তত্ত্বাবধানে।

হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চলের বনবাদাড়ে টহল দিতে দিতে সেদিন রমেশ সামন্ত হাজির হলো এই রেস্ট হাউসে। রমেশবাবু বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়ার একজন উদ্ভিদবিশারদ এবং গবেষক। তার এই ভ্রমণের উদ্দেশ্য হিমালয়ের গায়ে নতুন নতুন উদ্ভিদের সন্ধান করা। হিমালয়ে তো শুধুই পাথর নয়, সেখানে এক বিশাল উদ্ভিদকুল অবস্থান করছে। দীর্ঘদিন ধরে হিমালয়ের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে রমেশ সামন্ত যখন হিমঢাকা চটিতে এসে হাজির হলো তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে। পরিচয়পত্র দেখে কেয়ারটেকার রাজবাহাদুর রমেশকে রেস্ট হাউসে আশ্রয় দিল।

রমেশ দেখল রেস্ট হাউসের ঘরগুলো পার্বত্য গুহার মতো রহস্যময়। এবড়ো খেবড়ো পাথরের দেওয়াল। মেঘে ঢাকা তুষারভূমিতে অবস্থিত বলে ঘরের ভেতরটাও যেন স্যাঁতসেঁতে। দেওয়ালে পাথরের জোড়গুলোর কোথাও কোথাও শেওলার সবুজ রেখা পড়েছে। ঘরের মধ্যে রাজবাহাদুর একটা বাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গেল বটে কিন্তু তার দুর্বল আলো ঘরের অন্ধকার সম্পূর্ণ দূর করতে পারছে না। আলো, অন্ধকার আর নিস্তব্ধতা তিনে মিলে ঘরের ভেতরটা আরো রহস্যময় করে তুলেছে।

রাজবাহাদুর একটা লোটা হাতে এসে শুধাল, বাবু, ঠাণ্ডার মধ্যে দিয়ে এসেছেন–ফায়ার প্লেসে আগুন জ্বালিয়ে দেবো?

তার আগে এক কাপ চায়ের ব্যবস্থা করতে পারবে রাজবাহাদুর?

এই তো এনেছি বাবু।–বলে রাজবাহাদুর ঘটিটা বাড়িয়ে দিল।

এ যে লোটা? ঘটিতে করে চা?

কাপ বা কাঁচের গেলাসে সঙ্গে সঙ্গে ঠাণ্ডা হয়ে যাবে

যাবে বাবু। লোটাতে চা অনেকক্ষণ গরম থাকে। এ দেশের ঠাণ্ডা তো দেখছেন।

রমেশ হেসে বলল, আচ্ছা আচ্ছা। দাও। একটু পরে চায়ের ঘটিতে চুমুক দিতে দিতে রমেশ বলে, আচ্ছা রাজবাহাদুর, এখানে রান্না করে কে?

আমিই বাবু।

আর কাউকে তো দেখছি নে। কোনো চৌকিদার নেই?

আমিই চৌকিদার।

সে কি? তুমি কেয়ারটেকার, রাঁধুনী ঠাকুর আবার চৌকিদার?

আমিই সব বাবু। ওদিকের ঘরের ঐ মিলিটারী লোক দুটো ছাড়া আমার সংগে এখানে আর কেউ নেই। যাকগে, আপনি আরাম করুন, আমি রান্নার কাজটা সেরে ফেলি।

রাজবাহাদুরের ব্যবস্থায় রমেশের আহার সারা হলো। তারপর রাজবাহাদুর ঘরের ফায়ার প্লেসে কয়েকখানা মোটা কাঠ ফেলে আগুন ধরিয়ে দিয়ে গেল। আগুনের ছোট ছোট শিখাগুলি সাপের জিবের মত লক-লক করতে লাগল।

হঠাৎ রমেশের দৃষ্টি পড়ল ঘরের এবড়ো খেবড়ো পাথরের দেওয়ালের ওপর। ফায়ার প্লেসের আগুনের আলোয় কালো পাথুরে দেওয়াল রক্তমাখা মেটের মতো দেখাচ্ছে। আগুনের শিখাগুলি যেমন কাঁপছে, তার আভায় লাল দেওয়ালটাও যেন তেমনি কাঁপছে। কোনো এক বন্য জন্তুকে কাটলে তার ফিনকি দেওয়া রক্ত যেমন গুহার দেওয়ালে ছিটকে ছিটিয়ে লেগে যায় তেমনি এক রক্তমাখা গুহার দেওয়াল মনে হচ্ছে রমেশের সামনে। মনে হচ্ছে সে নিজেই যেন আদিম মানুষ হয়ে গেছে।

ক্রমে রাত গভীর হতে লাগল।

কে?—হঠাৎ রমেশ অস্ফুট আর্তনাদ করে উঠল। কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময় ও আতংকে তার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

ঘরে জানলা বলতে কিছু নেই। কিন্তু বারান্দার দিকের দেওয়ালের মাঝখানে এক ফুট করে চওড়া কয়েকটা ফুটো আছে। তারই একটা ফুটো দিয়ে একটা মানুষের মুখ ঘরের ভেতর দিকে ঝুঁকে পড়েছে। হনুমানটুপিতে সারা মুখ মাথা ঢাকা। ফায়ার প্লেসের আগুনের লাল আলো পড়ে তার চোখ দুটো আগুনের ভাটার মতো জ্বলছে। বিকট দেখাচ্ছে মুখটা। তার চেয়েও বিকট অথচ ভারি তার কণ্ঠস্বরঃ তুমি কে? জগৎ কী?

তুমি কে?—এই প্রশ্নের জবাব দেওয়া শুধু রমেশ কেন, অনেকের পক্ষেই কঠিন। কারণ তার সংগে আর একটা প্রশ্ন জড়িয়ে দিয়েছে ঐ আগন্তুক : জগৎ কী?

প্রশ্ন করেই হনুমানটুপিতে ঢাকা মুখটা অদৃশ্য হয়ে গেল। জবাব পাওয়ার জন্য একটুও অপেক্ষা করল না।

ব্যাপারটা কিছুই বুঝল না রমেশ। এখানে রাজবাহাদুর আর ঐ ফৌজী লোক দুটি ছাড়া আর কেউ থাকে না। আশপাশে কোনো গ্রাম লোকালয়ও নেই। তবে ঐ রহস্যজনক মুখটা কার? রমেশ একজন বিজ্ঞানী হয়েও ঘাবড়ে গেল মনে মনে। বেশ ভয় ভয় করতে লাগল তার। এত দিন পর কি তাকে সত্যিই ভূত বিশ্বাস করতে হবে?

রমেশ খাটিয়া বিছানা টেনে ফায়ার প্লেসের কাছে নিয়ে এল। কাঠগুলো ঠেলে ঠেলে আগুন বাড়িয়ে দিল। তারপর শুয়ে শুয়ে সেই বড় ঘুলঘুলির দিকে একদৃষ্টে চেয়ে থাকল অনেকক্ষণ। কিন্তু না—সেই মুখটা আর দেখা দিল না।

তারপর কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল রমেশ সামন্ত।

ভোর রাতেই ঘুম ভেঙে গেল রমেশের। কারণ কে ঐ লোকটা—সে প্রশ্ন তার মনে থেকেই গিয়েছিল। এমনও তো হতে পারে যে, কেউ একজন ঘরের বাইরের বারান্দায় শুয়েছিল এবং এক সময় দেওয়ালের ঘুলঘুলিতে মুখ এনে রমেশের সংগে কথা বলতে চেয়েছিল। ভোরে ঘুম ভাঙতেই রমেশ ঝটপট বারান্দায় বেরিয়ে এসে দেখে কেউ নেই।

রমেশ আর শুতে গেল না। কম্বল মুড়ি দিয়ে বেরিয়ে পড়ল প্রাতঃভ্রমণে।

বাইরে বরফ বিছানো প্রান্তরের ওপর দিয়ে চতুর্দিকে ঘন কুয়াশার মেঘ কুণ্ডলী পাকিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ঐ কুয়াশা ভেদ করে সূর্য উঠবে কি না তার কোনো ঠিক-ঠিকানা নেই। তবু ভোরের রূপোলী আলোয় মোটামুটি সবই দেখা যাচ্ছে। রমেশ উদ্ভিদবেত্তা। যে উদ্দেশে সে এসেছে সেটা হলো নতুন নতুন উদ্ভিদের সন্ধান করা। কিন্তু না। এই কুহেলিকাচ্ছন্ন তুষারভূমির কোথাও কোথাও কয়েকটি পরিচিত বৃক্ষ ছাড়া কোনো অপরিচিত নতুন উদ্ভিদ তার চোখে পড়ল না। শীতের প্রকোপে একসময় তার চায়ের পিপাসা পেয়ে গেল। সে ফিরে চলল রেস্ট হাউসের দিকে।

মনে তার সেই হনুমানটুপি মুখটা ভাসছেই। তবু সারাদিন রমেশ সে সম্বন্ধে রাজবাহাদুরকে কিছু শুধাল না। বরং অপেক্ষা করল যদি আজ আবার রেস্ট হাউসে সেই মুখটা দেখা দেয়।

হলোও তাই। রাত গভীর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আবার সেই আওয়াজঃ তুমি কে? জগৎ কী?

রমেশ চমকে উঠে দেখে ঘুলঘুলির ফাঁকে সেই মুখ।

বলতে পারলে না?–হনুমানটুপি মুখ থেকে বেরিয়ে এল ,থেলিজ বলেছে তুমি এবং সকল জীবের সৃষ্টি ও লয় হচ্ছে জল থেকে। জলই সব কিছুর আধার। এ কথা ঠিক?

এতটা বলেই সে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল।

এদিকে রমেশ সামন্ত ভয়ে কাঁপছে। লোকটার মুখ থেকে শোনা এবারের কথায় রমেশ আরো অবাক হলো। থেলিজ ছিলেন এক গ্রীক দার্শনিক। প্রসিদ্ধ হলেও তাঁর নাম কেবল বইয়েই পাওয়া যায়, এ যুগের লোকের মুখে মুখে ঘোরে না। রমেশ বুঝতে পারল না, প্রায় হারিয়ে যাওয়া থেলিজের নাম কেন ঐ লোকটা টেনে আনল? ও কী বলতে চায়? কেন বলতে চায়? আসলে ও মানুষ, না প্রেতাত্মা? এই জনশূন্য তুষার প্রদেশে হঠাৎ একটা অপরিচিত মানুষের আবির্ভাব হলো কী করে? ও থাকেই বা কোথায়? এই প্রচন্ড ঠান্ডার মধ্যে ঘরের বাইরে ও একা ঘুরে বেড়ায় কী ভাবে? কোনো রক্তমাংসের মানুষ তো তা পারে না। তবে কি ও মানুষ নয়? অনুভূতিহীন অশরীরী, যাকে শীত ও উত্তাপ স্পর্শ করতে পারে না?

আর ভূতই যদি হয়–ও কি কোনো দার্শনিক ভূত?

রমেশ জীবনে কখনো ভূত দেখেনি। আজ যদি বা একটা দেখল–একেবারে দার্শনিক ভূত!

অনেক কিছু ভাবতে ভাবতে রমেশ কখন যেন ঘুমিয়ে পড়ল। কিন্তু ভোর রাতে আবার সেই কণ্ঠস্বরঃ জবাব দিলে না যে?

ঝট করে ঘুম ভেঙে গেল রমেশের। ধড়ফড় করে উঠে দেখে দেওয়ালের ফুটোয় সেই মুখ। সে মুখে সেই একই প্রশ্নঃ তুমি কে? জগৎ কী?

এ সব কিছুর উত্তর জল।–রমেশ এবার সাহস করে জবাব দিল।

ধেৎ।–হনুমানটুপি পরা লোকটা তাচ্ছিল্যভরে উড়িয়ে দিল রমেশের কথা।

রমেশ বলল, তুমিই তো বলেছ দার্শনিক থেলিজ নাকি

কিছুক্ষণের জন্য বিস্ময় ও আতঙ্কে তার কণ্ঠ আড়ষ্ট হয়ে গেল।

রমেশ থমকে দাঁড়াল।

বলেছেন এ কথা ?

হ্যাঁ। কিন্তু আমার নয়। দার্শনিক থেলিজের কথা। কিন্তু অ্যানাক্সিমিনিজের কী কথা ?

অ্যানাক্সিমিনিজ কে ?–রমেশ শুধাল।

সে আর একজন দার্শনিক। অ্যানাক্সিমিনিজ বলেছে সমস্ত দৃশ্যমান জগতের মূল আধার বায়ু। বায়ু বিরল হলে তাপ, তাপ থেকে আগুন এবং ক্রমে সূর্য-তারকা হয়। আবার বায়ু ঘন হলে হয় পৃথিবী এবং ক্রমে জীব ও উদ্ভিদ প্রভৃতি সৃষ্টি হয়। অতএব বায়ুই সব কিছুর আধার। তাই বলে কি সেটাও সত্যি ? কিছু বলতে পারি– আমারও কিছু বলার থাকে–

বলতে বলতে মুখটা দেওয়ালের বড় ছিদ্রপথ থেকে অদৃশ্য হয়ে গেল।

রমেশ ঝট করে উঠে দাঁড়াল। মোটা কম্বলটা তুলে নিয়ে গায়ে মাথায় মুড়ে নিল। তারপর ঘরের দরজা খুলে যেন নিশির ডাকে বেরিয়ে পড়ল রেস্ট হাউসের বাইরে।

কিন্তু কই ? সে কোথায় গেল ?

রেস্ট হাউসকে পেছনে ফেলে রমেশ দ্রুতপায়ে এগিয়ে চলল বরফজমা মাঠের মধ্যে দিয়ে। তার মনে হলো তাড়াতাড়ি হাঁটলে নিশ্চয় ধরতে পারবে তাকে। এই ফাঁকা মাঠের মধ্যে রমেশকে ফাঁকি দিয়ে কোথাও সে আত্মগোপন করতে পারবে না। রমেশ এবার ছুটতে আরম্ভ করল।

ছুটতে ছুটতে কতদূর এসে পড়েছে সে নিজেও জানে না। রমেশের চোখে পড়ল দূরে বরফে ঢাকা একটা হিমশৈল দাঁড়িয়ে। সেই পাহাড়ের গা বেয়ে একটার পর একটা কুয়াশার মেঘকুণ্ডলী নেমে এসে বরফের মাঠের ওপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার দিকে এগিয়ে আসছে। আর তাদের সঙ্গে এগিয়ে আসছে একটা লোক।

রমেশ থমকে দাঁড়াল।

হ্যাঁ, সেই হনুমানটুপি পরা মানুষটাই। ওর পরনে ফুলপ্যান্ট, পায়ে জুতো মোজা অ্যাংক্লেট, গায়ে কোট, গলায় মাফলার, হাতে দস্তানা, চোখে চশমাও।

চোখে মুখে তুষারকণা ছিটিয়ে দিয়ে কয়েকটা মেঘকুণ্ডলী ঝড়ের মত এসে রমেশের ওপর দিয়ে চলে যেতেই দেখে সেই লোকটা একেবারে তার সামনে এসে হাজির।

কে তুমি ? জগৎটা কী ?–সেই প্রশ্ন।

রমেশ এবার ভীষণ রেগে গেল। একরকম ধমক দিয়েই বলল, বারবার দেখা করছ আর তুমি আমাকে চেন না ? এবার তুমি বল কী জন্য বারবার আসছ ?

এখন তো এই দুর্যোগের মধ্যে তুমিই রেস্টহাউস ছেড়ে বেরিয়ে এসেছ ? তুমি বল কী জন্য এসেছ ?

রমেশ বলল, আমি তোমার সন্ধানেই এসেছি। জানতে চাই তোমার ঐ একই অদ্ভুত প্রশ্নের অর্থ কী?

লোকটা হেসে উঠল এবং বলল, এ প্রশ্নের অর্থ ও উত্তর পাচ্ছে না বলেই তো দার্শনিকরা আজো খুঁজে বেড়াচ্ছে। আমি শুধু তোমার মত কী সেটাই জানতে চেয়েছিলাম, যদি আমার মতের সংগে মেলে।–লোকটা এবার উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠল। আকুল অনুনয়ে বলল, বলবে, বলবে? তোমার মতটা বলবে? তোমারটা যদি আমার মতের সংগে মিলে যায়, আমি নিশ্চিন্ত হবো। ওসব থেলিজ অ্যানাক্সিমিনিজের কথা আমার মনে ধরে না।

তোমার মতটা কী শুনি?–রমেশ শুধাল।

জলও না বাতাসও না। বরফ। বুঝলে? বরফ। সমস্ত কিছুর অস্তিত্বকে অটুট রাখার ক্ষমতা রাখে বরফ। বরফের তলায় আশ্রয় পেলে মরেও কোনো জীবের দেহ পচে না, নষ্ট হয় না। এই বরফের তলায় কোথাও না কোথাও তারা আছে।

লোকটার কথা যত শুনছে ততই রমেশের বিস্ময় বেড়ে যাচ্ছে। ওর কথাগুলো ঐ কুয়াশার মত রহস্যের ঘন জাল বিস্তার করে রমেশকে আচ্ছন্ন করে ফেলছে। রমেশের মুখ থেকে একটা অস্ফুট শব্দ বেরিয়ে এল ঃ আছে?

হ্যাঁ, আছে। তারা হারায়নি। আমি তাদের পাবোই। হারায়নি–হারায়নি–

বলতে বলতে লোকটা ছুটে পালিয়ে গেল। দূরে ঐ হিমশৈলের পাদদেশে কুয়াশা কুণ্ডলীর মধ্যে হারিয়ে গেল।

রেস্ট হাউসে ফিরে এসে রমেশ রাজবাহাদুরের মুখ থেকে সব জানতে পারল।

রাজবাহাদুর বলল, আরে ও তো আমাদের বোস সাহেব। আপনাকেও দেখা দিয়েছে তাহলে? দার্শনিক কাকে বলে জানি না বাবু, তবে বোস সাহেব এঞ্জিনিয়ার ছিল। এই রেস্ট হাউসের বাড়িটা সেই তৈরি করেছে। একদিন স্ত্রী আর কন্যাকে নিয়ে বরফের মাঠে বেড়াতে বেরিয়েছিল। ওখানে যে বরফের পাহাড়টা আছে তার ওপর থেকে বরফের ধস নেমে তার স্ত্রী কন্যাকে চাপা দিয়ে দেয়। অনেক চেষ্টা করেও তাদের দেহ খুঁজে পাওয়া যায়নি। কিছুদিন বোস সাহেব ঐ বরফের মাঠে মাঠে পাগলের মত ঘুরে বেড়াল। তারপর একদিন কোথায় চলে গেল কেউ জানে না। সে আজ আঠার বছর আগেকার কথা। মনে হয় বোস সাহেবও কোথাও বরফের তলায় চাপা পড়ে মারা গেছে। এখন যে মাঝে মধ্যে দেখা দেয় সে তার প্রেতাত্মা।

তোমার গল্প শেষ?–রমেশ শুধায়। বোস সাহেবের গল্পটা এত ছোট্ট করে শেষ হওয়াটা যেন তার পছন্দ নয়।

রাজবাহাদুর বলল, গল্প নয় বাবু–সব সত্যি।

রাজবাহাদুর!

কিছু বলছেন বাবু?

সবই যখন সত্যি, বোস সাহেবের ঐ কথাটাও সত্যি।

কোন্ কথাটা?

হারায়নি–তারা হারায়নি। কিছু হারায় না।

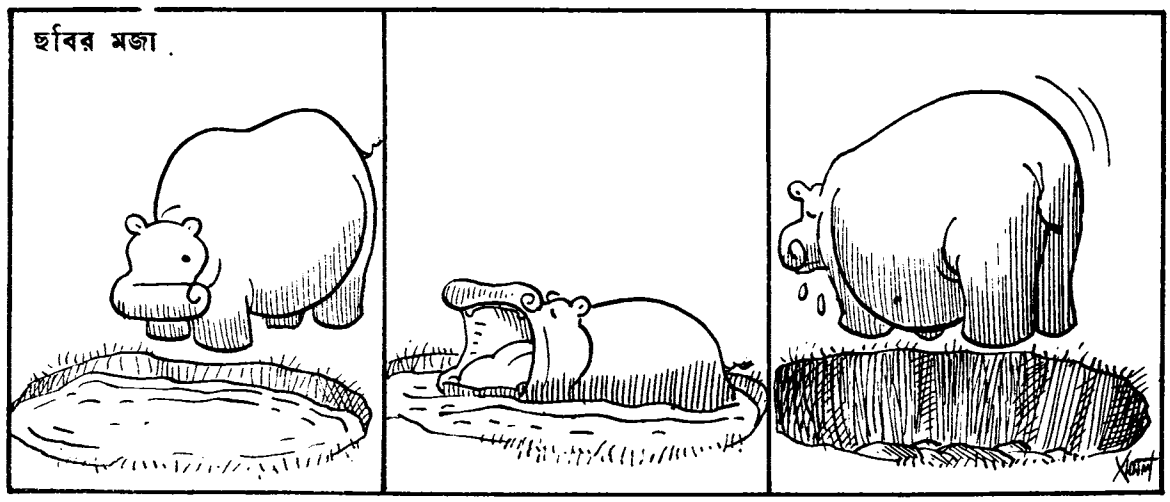

সব্যসাচী

২

ভাবতে ভাবতে কখন ওর দু'-চোখ বুজে এসেছে, তা জানে না হেস্টর। হঠাৎ তন্দ্রা ভেঙে গেল একটা মানবকণ্ঠের ক্রুদ্ধ গর্জনে। চোখ মেলে তাকিয়েই সে যা দেখতে পেলো, তাতে তার বুকের রক্ত জল হয়ে যাওয়ার কথা। এবার সিংহ নয়, একটা চিতা মাত্র। কিন্তু চোরের মত পা টিপে টিপে সেই চিতা এসে একেবারে শিওরে দাঁড়িয়েছে ওর, বড়জোর বিশ ফুটের দূরত্বে। মাটিতে বুক ঠেকিয়ে সে আস্ফালন করছে তার লাঙ্গুলের ডগা, এইবার সে লাফ দেবে। এমন সময়–

সেই অজানা ভাষার দুর্বোধ্য তর্জন আবার। এসেছে আবার সেই পরিত্রাতা। এখনও খানিকটা দূরে বটে, কিন্তু সে নিকটে আসবার আগেই শীটা লেজ গুটিয়ে স্থান ত্যাগ করল। সম্ভবতঃ ক্ষণপূর্বের সেই সিংহ-টারজান মুলাকাতের ব্যাপারটা সে আড়াল থেকে চোখে দেখে থাকবে। ঐ কৌপীনধারী নরাকার, দৈত্য যে কী ধরনের জীব, তার সম্বন্ধে একটা ধারণা তার আগে থেকেই জন্মে থাকবার কথা তাহলে।

"খুব সময়ে এসে পড়েছি"–বলতে বলতে টারজান একটা খরগোশ আর দু'টো অনতিবৃহৎ পাখি কাঁধ থেকে নামিয়ে মাটিতে রাখল–"এইবার তোমার খাবার ব্যবস্থা করছি, দাঁড়াও। আমি একা হলে আগুনের কোন দরকার হত না। কিন্তু তোমার তো আর কাঁচা মাংস খাওয়া অভ্যাস নেই, কী বল?"

"কাঁ-চা? কাঁচা মাংস? তুমি খাও নাকি?" –হেস্টর অতিকষ্টে ভাষায় প্রকাশ করল তার অতিস্বাভাবিক প্রশ্ন।

"নিশ্চয়ই খাই। রান্না করার ঝামেলা কত! কত দামী সময় যে আমরা নষ্ট করি রান্নার ব্যাপারে! তা ছাড়া, কাঁচা মাংসের উপকারিতা রান্না-করা মাংসের অন্ততঃ ডবল। কিন্তু তোমার যখন অভ্যাস নেই, আজই আমি তোমাকে বলব না কাঁচা মাংস খেতে। খেতে পারবেও না। কষ্টে-সৃষ্টে গলাধঃকরণ করলেও, হয়ত তা বমি হয়ে যাবে। হিতের চাইতে অহিতই করবে তোমার।"

মুখে অনর্গল কথা। ওদিকে দুই হাতে অবিরাম কাজ। বেছে বেছে নুড়ি পাথর নিয়ে এসেছে দু'খানা। সুকৌশলে তাই ঠোকাঠুকি করে করে আগুনের ফুলকি বার করেছে

দেব সাহিত্য কুটীরের নবতম উপহার

ক্রাইম সিরিজ

রহস্য, রোমাঞ্চ, সন্ত্রাস, গুপ্তচর আর গোয়েন্দা কাহিনী নিয়ে রুদ্ধশ্বাস উপন্যাস। প্রতি মাসে একটি করে বেরুচ্ছে। প্রত্যেকটি বইয়ের দাম মাত্র সাত টাকা।

লিখছেন বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক

ধ্রুবজ্যোতি রায়চৌধুরী

১৫ই জুলাই বেরিয়েছে

জ্বলন্ত আগুন

মিউনিখ থেকে ভিয়েনা আসছে সাসিট এক্সপ্রেস, ভেতরে চার রাষ্ট্রনায়ক। তাঁদের খুন করবে জনৈক দেহরক্ষী। ঘাতক সংস্থার নেতৃত্ব দিচ্ছেন পদ্মনাভন। এর আগেই এক ভারতীয় এজেন্ট খুন হয়ে গেলেন এক নির্জন হ্রদে– তারপর...আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের এক নৃশংস দৃশ্যপট।

১৫ই আগস্ট বেরিয়েছে

মৃত্যুদূতের শেষ প্রহর

গুপ্তঘাতক দলের নেতা মৃত্যুদূত, ভারতবর্ষের চরম শত্রু। একটি লোক, যে বিদেশ থেকে ভারতে আশ্রয় নিয়েছে সেই শুধু জানে এই গুপ্তঘাতকের প্রকৃতি। মৃত্যুদূতের সবচেয়ে সাংঘাতিক চক্রান্তে সারা ভারত ওলোট পালোট হয়ে যাবে। এই চক্রান্তের খবর কানে এলো এক ভারতীয় এজেন্টের। মরণপণ সংগ্রামের জন্য তৈরী হল সে...

১৫ই সেপ্টেম্বর বেরুবে

অদৃশ্য কালোহাত

সশস্ত্র সন্ত্রাসবাদীদের একটি মিনি-বাস আমস্টারডাম থেকে স্থলপথে আসছে বম্বে। সেই মিনি-বাসে লন্ডন প্রবাসী দুজন ভারতীয় ছাত্রী! গ্রীস-তুর্কী-আফগানিস্থান-বেলুচিস্থান-পাকিস্তানের ভেতর দিয়ে মিনি-বাসটি ভারতবর্ষের দিকে এগিয়ে আসছে কোন দুঃস্বপ্ন নিয়ে?

এর আগে বেরিয়েছে

বুলেটের শিস্: উজ্জ্বল নীল মৃত্যু: উড়ন্ত বাজ

দেব সাহিত্য কুটীর: ২১ঝামাপুকুর লেন,কলকাতা-৯

তা থেকে। নিবে যেতে দেয় নি সে-ফুল্‌কিকে। শুকনো ঘাস আর ডালপাতা তাই দিয়ে জ্বালিয়ে তুলেছে সাবধানে, সযত্নে। দুই মিনিটের মধ্যে জ্বলে উঠল আগুন। তিন টুকরো পাথর দিয়ে গড়া ছোট্ট উনুনে সিদ্ধ হতে লাগল ছাল-ছাড়ানো খরগোশ আর তিতির পাখি।

আধ ঘন্টার মধ্যেই খেতে বসে গেল দুই সদ্য পরিচিত বন্ধু। বন্ধু ছাড়া আর কী? হিন্দুর শাস্ত্রে স্পষ্ট বলা হয়েছে, সাত পা পাশাপাশি হাঁটলেই বন্ধু জ্ঞান করতে হবে মানুষকে। তা পাশাপাশি হাঁটার চেয়েও ঢের-ঢের নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা কি এই দুটি মানুষের মধ্যে স্থাপিত হয় নি এই এক ঘন্টা সময়ের মধ্যে?

খাওয়ার পরে টারজান বলল–"এবার যদি একটু বল পেয়ে থাক, তোমার পরিচয়টা আমায় দিতে পার। সত্য কথা বলতে কী, তোমার সম্বন্ধে আমি কৌতূহল বোধ করছি অপরিসীম। কারণ? কারণ, কিলিমাঞ্জারোর কোলে এই যে অভিশপ্ত মরুকান্তার কালকালা, এখানে মানুষের সমাগম একান্ত বিরল ঘটনা। কালে-কস্মিন উপর -পাহাড়ের ওপার থেকে কালো মানুষেরা যদি-বা আসে কোন বিশেষ দরকারে, তারা ফিরে যায় যত শীঘ্র সম্ভব। এখানে থাকা মানে তো না-খেয়ে মরা! জলবিন্দুটুকুরও পিত্যেশ নেই এই তেপান্তর মাঠে।"

পল হেক্টর একমনে শুনছে টারজানের কথা। এতক্ষণে একটা কথা বলল–"সে তো চোখেই দেখলাম। দৈবাৎ তোমার চোখে না পড়ে গেলে তো আমার এই দেহের অর্ধেক এতক্ষণ যেত সিংহের পেটে, আর বাকী অর্ধেক যেত শকুনের।"

"যা বলছিলাম"–টারজান থামিয়ে দিল ওকে–"ঐ যে উপর-পাহাড়, এমন বেশী দূর নয় এখান থেকে। ঐ পাহাড়ে বসতি আছে কালো মানুষদের। বর্বর জাতির লোক তারা। আছে তারা নিকটেই, কিন্তু প্রাণান্তেও তারা কালকালায় আসে না। সে-অবস্থায় সাদা মানুষ তুমি–তোমার তো মোটে এ-অঞ্চলে আসারই কথা নয়। তুমি এই যমের দোরে এসে ঢুকলে কী বলে?"

"তুমিও তো সাদা মানুষ!"–বলল পল হেক্টর।

টারজান হেসে ফেললো–"হ্যাঁ, আমিও সাদা মানুষ। কিন্তু ইংল্যান্ডে পৈতৃক বাড়ি থাকা সত্ত্বেও আমি স্থায়ীভাবেই বাস করি আফ্রিকায়। এখন যে উত্তর আফ্রিকার দিকে চলেছি, সে আমার নিজের কোন প্রয়োজনে নয়। এক বিখ্যাত ব্যক্তি আমার উপরে ন্যস্ত করেছেন এক গুরুদায়িত্ব। তাঁর অনুরোধেই আমার এই সফর। কালকালা যে সাদা-কালো সব মানুষেরই পক্ষে

মৃত্যুফাঁদের মত, তা জেনেশুনেই আমি এসেছি। ভাগ্য বিরূপ হলে লর্ড হেমলটের মত আমিও যে হারিয়ে যেতে পারি এই আঁধার মহাদেশে–"

টারজানের কথা শেষ হওয়ার আগেই হেক্টর ওদিকে চাপা গলায় বিস্ময়ের আওয়াজ করে উঠেছে একটা–"লর্ড হেমলটের কথা তুমি জানো? আমি যে সেই হারিয়ে-যাওয়া লর্ড মহাশয় আর তাঁর স্ত্রীর সন্ধান করার জন্যই এসেছি আফ্রিকায়!"

"একা?" –অবিশ্বাসের সুর বেজে উঠল এবার টারজানের কথায়।

"না, একা কেন হবে? আমেরিকার "রাইজিং ম্যান" সংবাদপত্র পঞ্চাশ জনের একটা দল পাঠিয়েছিল হেমলটের সন্ধান করার জন্য। আমরা মাকুং নদীর উৎস পর্যন্ত ঠিক পথেই এসেছিলাম। হেমলট যে ঐ পথেই সফর করেছিলেন, তার প্রমাণ আমরা পাচ্ছিলাম পদে পদে। কিন্তু মাকুংয়ের উৎসে পৌঁছোবার পরেই–"

হেক্টর এইবার থেমে গেল। দুঃখ, নৈরাশ্য, অনুশোচনা সবে মিলে যুগপৎ এসে কণ্ঠরোধ করল তার।

টারজান সমবেদনার সুরে জানতে চাইল–"পঞ্চাশ জন? তাহলে তুমি একা কেন এখন? বাকী সবাই কোথায়?"

"যাদুর দেশে"–জবাব দিতে গিয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠল হেক্টর। "উত্তর আফ্রিকার সব চেয়ে কুখ্যাত যাদুকর ডাইন যে ভাকলুভাম, তারই খপ্পরে গিয়ে পড়েছিলাম আমরা। আমার সংগীরা সেই যাদুকরেরই ক্রীতদাস হয়ে আছে সেই দেশে। আমিও ছিলাম তাই। কী করে পালিয়ে এসেছি, শুনতে চাও যদি, পারি বলতে। কিন্তু বলে যে লাভ নেই কিছু, তা আমি বিলক্ষণ জানি। দেখতেই পাচ্ছি, তুমি অশেষ শক্তিমান পুরুষ। কিন্তু ভাকলু ডাইনকে তুমি দেখ নি, আমি দেখেছি। তার বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আমার কোন সাহায্য যদি করতে যাও তুমি, ফল তাতে কিছু হবে না। মাঝখান থেকে তুমি বেচারী মারা পড়বে সেই পিশাচ ডাইনের রোষে।"

"ইংল্যান্ডের লোক যখন তুমি, অন্ততঃ দুই একবার হয়ত গিয়ে থাকবে সে দেশে–"

পল হেক্টর বলতে শুরু করেছে তার গল্প। খেতে যতই অরুচিকর লাগুক, আধা-ঝলসানো তিতির আর খরগোশ খাবার পরে দেহে আবার খানিকটা বল পাচ্ছে বেচারী।

"গিয়ে যদি থাক, শিকাগোর "রাইজিংসান" কাগজ-খানার নাম তোমার অজানা থাকতে পারে না। ইংল্যান্ডে এত বেশী কাটতি ওটার যে লন্ডন থেকে ওর একটা

এক দৌড়ে বেরিয়ে পড়লাম তাম্বু থেকে।

আলাদা সংস্করণ বার করার ব্যবস্থা হয়েছে গত বৎসর থেকে। সেই রাইজিং সানই কাঁড়ি কাঁড়ি ডলার খরচা করে আমাদের আফ্রিকায় পাঠিয়েছিল নিরুদ্দিষ্ট লর্ড হেলমট আর তাঁর স্ত্রীর সন্ধান করার জন্য। পঞ্চাশটা লোক ইংরেজে আর মার্কিনে মিলে। আমি? আমি এ-ব্যাপারের গোড়া থেকেই ছিলাম সংগঠকদের সঙ্গে। কী সূত্রে, জানতে চাইছ? বলতে বাধা নেই। রাইজিং সান-এর ছোট অংশীদার যে ন্যাথানিয়েল হর্ন, বড়লোক হলেও সে এই দীনহীনকে বন্ধুজ্ঞান করেছে চিরদিন। যাকে বলে বাল্যবন্ধু, ঠিক তাই আমরা দু'জনে। হ্যাঁ, এসেছে বই কি, ন্যাথানিয়েলও এসেছে এই অপয়া অভিযানের সঙ্গে। সে এসেছে বলেই আমাকেও আসতে হল। তা নইলে তেরো নম্বর এ্যাভিনিউয়ের মনিহারি দোকান থেকে আমি নড়তাম না কোনমতেই।

তা বলতে পার। ন্যাথানিয়েলের সুপারিশেই আমি নেতৃত্ব পেয়েছিলাম এই অভিযানে। অবশ্য নেতৃত্ব করবার মতো যোগ্যতাও আমার ছিল কিছু। এ-অভিযানে বেরুবার আগেও আমি তিনবার এসে গিয়েছিলাম আফ্রিকায়। এই উত্তর-পূর্ব অঞ্চলটাতে নয় অবশ্য, মধ্য-পশ্চিমের অরণ্যগুলোতে। শিকার? হ্যাঁ, শিকার বই কি! তবে হাতী বা সিংহ বা গরিলা শিকার নয়। হরিণ মেরেছি অগণ্য, তিনটে বুনো মোষ, আর ছোট আকারের চিতা একটা। তাদের মাথাগুলো টাঙানো আছে আমার মনিহারি দোকানে। হ্যাঁ, দোকানটা ছোট নয় একেবারে। মোষের মাথা টাঙাবার মতো জায়গাও আছে তার দেয়ালে।

যা বলছিলাম। ন্যাথানিয়েল নিজে ছিল অভিযানের খাজাঞ্চি, কোষাধ্যক্ষ, আমি ছিলাম ব্যবস্থাপক। আফ্রিকায় ঢুকেই আমি মুটে বহাল করেছিলাম পঞ্চাশ জন, সব বিভিন্ন উপজাতির নিগ্রো তারা। একশোটা লোকের অন্তত ছয় মাসের রসদ, পোশাক আশাক জুতো ছাতি, রাইফেল বারুদ বুলেট, আর সব-কিছুর চাইতে ঝামেলার জিনিস, দুই ডজন মাঝারি এবং এক ডজন ছোট সাইজের তাম্বু। খচ্চর আমরা নিই নি মাল বইবার জন্য। সিটসি মাছের কামড়ে তারা টপাটপ মারা পড়বে, এই আশঙ্কায়।

পঞ্চাশ জন নিয়েছিলাম নিগ্রো, আর দু'জন নিয়েছিলাম... কী বলে ভাল? দু'জন নিয়েছিলাম আফ্রিকা প্রবাসী সাদা মানুষ। দক্ষ শিকারী এরা। জন্মেছিল নাকি ইংল্যাণ্ডেই, কিন্তু আছে সারা জীবন এই দেশেই। পশ্চিম উপকূলে আইভরি কোস্ট আছে না? ওদের সেখানেই পাই আমরা।

ঠিক দুই বছর। আইভরি কোস্ট থেকে আফ্রিকার অভ্যন্তরে আমরা পা বাড়িয়েছিলাম ঠিক দুই বছর আগে। হেলমটদের কিছু কিছু চিঠিপত্র তাঁদের ইংল্যাণ্ডের বাড়ি থেকে আমরা পেয়েছিলাম। কোন পথে কোথায় যাচ্ছেন তাঁরা, তার মোটামুটি একটা বিবরণ সেসব চিঠিতেই ছিল। শেষ চিঠি লেখা হয় মাকুং নদীর উৎসমুখ থেকে। ডাকঘর? না, ডাকঘর সেখানে কোথায়? নিগ্রো মুটের হাতে সে-চিঠি ওঁরা পাঠিয়েছিলেন নিকটতম ডাকঘর নিউটাউনে।

ট্রান্স- আফ্রিকান রেলপথের নিউ স্যানড্রিংহ্যাম স্টেশন থেকে সোত্তর মাইল দূরে।

সে যা হোক, ওরকম সুদীর্ঘ অরণ্যপথ পায়দলে অতিক্রম করবার জন্য তৈরী হয়েই আমরা বেরিয়েছিলাম শিকাগো থেকে। আমরা যথাকালে, খুব বেশী পথকষ্ট ব্যতিরেকেই একদিন পৌঁছে গেলাম মাকুং নদীর উৎসমুখে।

এ-যাবৎ আমরা ঠিক ঠিক মিলিয়ে পেয়েছি হেলমটদের ভ্রমণপঞ্জীর প্রত্যেকটা পদক্ষেপ। বাইশ বছর আগে এক টিলার মাথায় ছাপড়া বেঁধে এক হপ্তা বাস করেছিলেন হেলমটেরা। সেই ছাপড়ার তিনটে রেড-উডের খুঁটি তখনও মাটিতে খাড়া আছে, দেখলাম। ব্যথা-হতাশার সে এক অসহ অভিজ্ঞতা।

যা হোক, এই তো লর্ড হেলমটের শেষ আস্তানা। অর্থাৎ এর পরের আস্তানাগুলির কোনো বিবরণ আমাদের হাতে পড়ে নি তখন পর্যন্ত। কাজেই আমাদের কর্তব্য এখন দাঁড়ালো, বাইশ বছর আগের সেই বিস্মৃত ইতিহাস নতুন করে আবিষ্কার করা।

কোথায় গিয়েছিলেন সস্ত্রীক লর্ড হেলমট, তাঁদের সাফারির লোকজন মালপত্র নিয়ে? অরণ্য পর্বত, উপত্যকা অধিত্যকা, সব-কিছুই সমান দুর্গম, সমান ভয়াবহ। পথ বলে কোথাও কিছু নেই, একমাত্র বন্য জন্তুর চলাচলের শুঁড়িপথ ছাড়া। তা সেগুলির তো অনিবার্য শেষ লক্ষ্য হল বনান্তরালে লুকোনো কোনো জলা বা ডোবা! ঐ রকম দুই চারিটা জুলি-পথে কয়েকদিন ঘোরাফেরার পরে আমরা ও-চেষ্টা ত্যাগ করলাম। না, ও-রকম কোনো পথে যান নি হেলমটেরা।

তবে গেলেন কোথায়? একটা দুটো মানুষ নয়, একটা গোটা সাফারি। সাদায় কালোয় মিলিয়ে পঞ্চাশ ষাটটা

মানুষ অন্ততঃ। কর্পূরের মতো উবে যাওয়ার বস্তু নয়। খুঁজলে পাওয়া যাবে না, এও কি সম্ভব ? খোঁজো, খোঁজো, আরও খোঁজো !

অবশেষে, আঁধারে আলো ফুটল শেষ পর্যন্ত। ঐ উৎসটাই ! মাকুং নদীর উৎস। বিশেষ পর্যবেক্ষণে একদিন ধরা পড়ল, সুদূর অতীতে কোনো এক সময় মাকুংয়ের জলধারা নিজের গতিপথ পালটে ফেলেছিল এক অজ্ঞাত কারণে। বর্তমান খাতের সঙ্গে প্রায় পঁয়তাল্লিশ ডিগ্রীর একটা কোণ রচনা করে ঐ যে বনভূমিতে প্রবিষ্ট হয়েছে আর একটা বালি আর পাথরে আকীর্ণ বিশীর্ণ খাত। তার প্রসার কোনো জায়গাতেই এখন আর জন্তুদের জুলি-পথের চেয়ে বেশী নয়।

কিছুদূর এগুনো গেল সেই পরিত্যক্ত খাত ধরে ধরে। আন্দাজ দুই মাইল সমতল অতিক্রম করার পরে সেটা হঠাৎ নীচু পানে হুমড়ি খেয়ে পড়ল এক গভীর খাদে। সে খাদ আবার ঝোপঝাড় লতাগুল্মে এমন আচ্ছন্ন, তার তলার অবস্থা কিছুমাত্র লক্ষ্য করা যায় না উপর থেকে।

সেই দুই ফিরিঙ্গি শিকারী, আইভরি কোস্টে যাদের আমি কাজে বহাল করেছিলাম, আলবুর্জ আর রীকি, তারা এইবার এগিয়ে এল একটা প্রস্তাব নিয়ে—"আমরা দু'জন রাজী আছি। নেমে গিয়ে নীচের অবস্থাটা দেখে আসতে। তবে দড়ি বেয়ে নামব আমরা, দড়ি বেয়ে উঠব। নীচে থেকে যদি আমরা সংকেত করি, এক সেকেন্ড দেরি না করে টেনে তুলতে হবে আমাদের।"

এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার মতো হেতু তো কিছুই চোখে পড়ল না। দড়ি বেয়েই নীচে নামল দুই শিকারী। পঞ্চাশ ফুট একটা দড়ি শেষ হবার আগেই ওরা নীচে থেকে চেঁচিয়ে উঠল—"আমরা খাদের তলায় পৌঁছে গেছি। দড়িগাছার এখনো প্রায় দশ ফুট বাকী। একটা গর্ত। সম্ভবতঃ মাকুং এখানে প্রপাতের আকারে নামত এক সময়ে। গর্ত থেকে যে খাতে জল নামত, তা এখনো রয়েছে, নুড়ি বিছানো চমৎকার পথ একটা, যতদূর দেখতে পাচ্ছি, একখানা গাড়ি চালাবার মতো চওড়া।"

আমরা সবাই উৎসাহিত, উত্তেজিত হয়ে উঠলাম। অবশ্যই এই পথেই গিয়েছিলেন হেলমটেরা। ঐ যে জংগলগুলো এখন ঢেকে ধরেছে গর্তটাকে, তা হয়ত ছিল না তখন।

নামব ঐ খাদেই। সর্বসম্মতিক্রমে। ও মশাই, অজানা

অনেক দিন পরে আবার বেরিয়েছে

ছোটদের বুক অফ নলেজ

(সম্পূর্ণ পরিমার্জিত, পরিবর্ধিত ও পরিশোধিত সংস্করণ)

বাংলা ভাষায় বুক অফ নলেজের অদ্বিতীয় বই। এমন কোনো বিষয় নেই যা এই বইটিতে নেই। এক কথায় বলা যায় সমস্ত পৃথিবীটিকেই এই বইটি এনে দেবে মুঠোর মধ্যে। ইতিহাস, ভূগোল, ধর্ম, দর্শন থেকে আরম্ভ করে মনীষীদের জীবনী, প্রাচীন গুহামানবের পরিচয়, হাল আমলের বিজ্ঞানের অগ্রগতি, মহাকাশ অভিযান, ভারতীয় মহাকাশযাত্রীদের কথা, খেলার কথা আরও অনেক অজানা কাহিনী। মস্ত আকারের বইটি পাতায় পাতায় ছবিতে ভরা। আর আছে অজস্র রঙিন ছবি।

দাম : ১২০ টাকা মাত্র

১২০ টাকা পাঠালে বইটি রেজিস্ট্রি করে পাঠানো হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

বিপদের মুখে ঝাঁপ দেবার কোনো ব্যাপারে মানুষের এত বেশী উৎসাহ আমি আগে আর দেখি নি। পরেও দেখব বলে আশা বা আকাঙ্ক্ষা করি না। একশো মানুষ, সাদা কালো নির্বিশেষে। টগবগ করছে যেন উত্তেজনায়। ঠিক যেন সেই "আগে কেবা প্রাণ/করিবেক দান/তারি লাগি কাড়াকাড়ি"। পথ-নির্ণয়ে অনিশ্চয়তা আগেও বহুক্ষেত্রে দেখা গিয়েছিল, তার সুষ্ঠু সমাধানও খুঁজে পাওয়া গিয়েছিল কিছু-কিঞ্চিৎ ভুল-বিচ্যুতির পরে, সে-সব উপলক্ষে তো এমন উন্মাদনা দেখি নি কারও!

ব্যাপারখানার দিকে আমি দৃষ্টি আকর্ষণ করলাম বন্ধু ন্যাথানিয়েলের "অবস্থাটা একটু অস্বাভাবিক ঠেকছে না?"

"তা ঠেকছে। শুধু অন্যদের কথাই নয়, আমি নিজেও যেন ঠিক স্বাভাবিক নই আর এখন। যাকে বলে দড়ি-ছেঁড়া টান। তাই যেন অনুভব করছি আমি। কী হল আমাদের বল তো? কেবলই যেন মনে হচ্ছে, ঐ নতুন পথটার প্রান্তে পৌছলেই লর্ড হেলমট আর তাঁর স্ত্রীকে সশরীরে, জ্যান্ত, সুস্থ এবং প্রকৃতিস্থ অবস্থায় দেখতে পাওয়া যাবে। সব সংশয়ের হবে অবসান, সকল উদ্যম হবে সার্থক, সফল অভিযাত্রীদের গলায় জয়মাল্য দেবার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকবে সমুদ্রপারের সভ্য জাতিরা।

আমি মুখে কিছু বললাম না, কিন্তু মনটা যেন ভয়ে কুঁকড়ে গেল আমার। আফ্রিকা বলে কথা। অকারণে 'আঁধার মহাদেশ' আখ্যা দেওয়া হয় নি একে। এর ভিতর কত না অজ্ঞেয় রহস্য ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে যত্র তত্র! অসাবধানে অনধিকারী কেউ তার ভিতর জড়িয়ে পড়ে যদি, নিস্তার পেয়ে বেরিয়ে আসা কঠিন হবে তার পক্ষে। এই যে আমরা, একশো মানুষের সুসম্বদ্ধ একটা সাফারি লাফাতে লাফাতে ঢুকে যাচ্ছি এক অজানা অঞ্চলে, এখান থেকে অক্ষত দেহে বেরিয়ে যেতে পারব তো আবার?

ন্যাথানিয়েলের সঙ্গে কথা কইছি পথঘাট সম্বন্ধেই। মন কিন্তু অস্থির। সুবুদ্ধি বলে একটা জিনিসের কথা জানা ছিল। সে যেন ক্ষীণ স্বরে প্রতিবাদ করছে অবিরত–"ফেরো, ফেরো, ওপথে যেও না। লর্ড হেলমট ঐ পথেই গিয়েছিলেন, তিনি আর ফেরেন নি। এখনও সময় আছে। মাকড়সার জাল এখনও তোমাদের স্বাধীন ইচ্ছাকে একেবারে আচ্ছন্ন করতে পারে নি। এখনও চেষ্টা করলে–"

কে করছে সে-চেষ্টা? এক এক পা এগোচ্ছি আর মন উৎসাহে ভরে উঠছে। পদযাত্রার শুরুতে যে দ্বিধার অস্তিত্ব ছিল অন্তরে, তা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে সূর্যোদয়ে কুয়াশার মতো। মন কেবলই বলছে "এগিয়ে চল। এগিয়ে চল! অপ্রত্যাশিত সাফল্য তোমাদের প্রতীক্ষায় আছে, ঠিক ঐ পথের মোড়ে। সারা দুনিয়ার অভিনন্দন অচিরেই অভিষিক্ত করবে তোমাদের।"

সারা দিন ঐ পথেই এগুতে থাকলাম আমরা। সারা দিন পথে কোথাও একটিও মানুষের সাক্ষাৎ পাই নি। রাত্রে সেই মাকুংয়ের শুকনো খাতের উপরেই তাম্বু খাটিয়ে নিলাম। মনে খুব ভরসা, কালই লর্ড হেলমটের দেখা পেয়ে যাব নিকটেই কোথাও। অন্ততঃ তাঁর সম্বন্ধে সঠিক খবর যে পাবই, তাতে একেবারে সন্দেহ নাস্তি।

কেউ যদি জিজ্ঞাসা করত সেই সময়ে, "তোমাদের এতটা নিশ্চয়তার ভিত্তি কী?" আমরা কেউই সে প্রশ্নের জবাব দিতে পারতাম না। অবস্থাটা কী আমাদের সেই মুহূর্তে, বুঝতে পারছ কি? একটা দুর্বার আকর্ষণ টের পাচ্ছি এগিয়ে যাবার জন্যে, কোনো যুক্তির অপেক্ষা রাখে না সে-আকর্ষণ। কোনো বাধাকেই করে না গ্রাহ্য।

শ্রান্ত দেহ কোনো এক সময়ে ওরই মধ্যে একবার নেতিয়ে পড়েছিল শয্যায়, চটকাটা ভেঙে গেল কী কারণে, তা বুঝলাম না। চোখ মেলতেই মুক্ত বাতায়নপথে দেখতে পেলাম মাকুং নদীর শুকনো খাত সাদা হটহট করছে পরিপূর্ণ জ্যোছনায়। আর আমি দেরি করলাম না এক সেকেন্ডও। লাফিয়ে নামলাম শয্যা থেকে। পোশাক পরে নিলাম দ্রুত হস্তে। এক দৌড়ে বেরিয়ে পড়লাম তাম্বু থেকে। লক্ষ্য কি করিনি? করেছিলাম ঠিকই।

লক্ষ্য করেছিলাম যে একা আমিই বেরুই নি আমার তাম্বু থেকে, বেরিয়েছে সাফারির প্রত্যেকটা মানুষ যে যার বিছানা ত্যাগ করে। দেখা হল বন্ধু ন্যাথানিয়েলের সঙ্গে, দেখা হল আফ্রিকাপ্রবাসী যুগল ইংরেজ আলবুর্জ আর রীকির সঙ্গে। "কোথাও যাও এত রাত্রে হন্তদন্ত হয়ে"– এমন কথা তারাও আমাকে জিজ্ঞাসা করে নি, আমারও এমন মনে হয় নি যে ন্যাথানিয়েল, আলবুর্জ বা রীকির এত রাত্রে এই আকস্মিক বহির্গমনের মধ্যে অস্বাভাবিক বা আশঙ্কাজনক কিছু আছে। মনোভাবটা আমার এইরকম তখন–"যাচ্ছে যাক। ফিরতে তো হবেই। জিজ্ঞাসাবাদ তখন করলেই তো হবে!"

চলেইছি! চলেইছি! ক্রমাগত এগিয়েই চলেছি। সময়ের হিসাব নেই। বেরুবার সময়ে ডাগর চাঁদ ছিল আকাশে। এখন সে যে নেই, তা আন্দাজ করছি এই কারণে যে পথে বা পথের দুই পাশে কী যে আছে, তা মালুম হচ্ছে না আদৌ।

[চলবে]

গোল করতে চলেছেন মোহনবাগানের শিশির ঘোষ

খেলা দেখা মানা

শান্তিপ্রিয় বন্দ্যোপাধ্যায়

বিল্টু-মন্টুরা চুপ করে বসেছিলো। ওদের মন টন ভালো নেই। সেজদাদু বলে দিয়েছেন, ফুটবলের নামও যেন ওরা উচ্চারণ না করে। ওদিকে স্কুলে নন্টে-ভন্টেরা লাফাচ্ছে। খালি বলছে, ফেডারেশন কাপের পর লীগ, তারপর আই. এফ. এ. শীল্ড, তারপর...

সহ্য করতে পারে না বিল্টু-মন্টুরা। মোহনবাগান যে কী! বড্ড কষ্ট হয় ওদের। সেদিন শংকরকাকু এসেছিলেন, ওরা দেখতে যাবে কিনা জানতে চাইছিলেন। ওরা বলে দিয়েছে, এবার আর ময়দানে যাবে না। তাছাড়া সেজদাদুও যেতে দেবেন না। সেজদাদু একবার না বললে কারো সাধ্য নেই যে হ্যাঁ করায়।

ওরা তাই 'ক্লাবের নাম মোহনবাগান' বইটা নিয়ে নাড়াচাড়া করে। ভন্টের জন্মদিনে 'ক্লাবের নাম ইস্টবেংগল' বইটা ওরা উপহার দিয়েছে। বইটা ওরা পড়েও নিয়েছে। খুব ভালো লেগেছে। বিশেষ করে ইস্টবেংগল ক্লাবের জার্সি কেনার ঘটনাটা।

লাল হলুদ ঐ জার্সিকেই তো ওদের যতো ভয়। ওদের এক নতুন স্যার একসময় নামকরা ফুটবল খেলোয়াড় ছিলেন। ইস্টবেংগল মোহনবাগান–দুদলেই খেলেছেন। তিনি বলেন, দুটি ক্লাবের জার্সি গায়ে দিলে শরীরটা গরম হয়ে ওঠে। কিন্তু খেলতে নামলে প্রথম দিকে বড্ড ভয় ভয় করে। গ্যালারিতে অতো মানুষ, কালো কালো মাথা, তাদের চিৎকার, চেঁচামিচি মাথা ঘুরিয়ে দেয়। তবে ক'দিন খেলতে খেলতেই ভয়-ভয় ভাবটা কেটে যায়। আর গোল দিতে পারলে তো কথাই নেই। সংগে সংগে মাঠের হিরো।

সারা স্কুলের কাছে এখন ঐ মাস্টারমশাই হিরো। তিনি কতো গল্প বলেন। মোহনবাগানের ১৯১১ সালে

আই. এফ. এ. শীল্ড জয়ের কথা। ইস্টবেংগলের প্রথম লীগ চ্যাম্পিয়ন হবার দিনের গল্প, আরও কতো কি!

একদিন বললেন, উনি তখন ইস্টবেংগলে খেলেন। সেবার ইস্টবেংগল লীগ চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। মাঠের মধ্যে খুব হৈ চৈ হচ্ছে, হঠাৎ একজন মোটা সোটা লোক শিবঠাকুর সেজে এসে হাজির। পরনে বাঘ ছাল, গায় ছাইভস্ম, হাতে ত্রিশূল আর গলায় মস্ত একটা জ্যান্তো সাপ। ঐ সাপ দেখেই তো ভয়ে সিঁটিয়ে গিয়েছিলেন। শিবঠাকুরকে দেখতে পায়। কিন্তু ওরা তো মোটে মাঠে যাবারই সুযোগ পায় না। বিল্টু-মন্টুরা গেলে শংকরকাকুর সংগে ওরাও এক আধদিন গড়ের মাঠে গিয়ে খেলা দেখে আসে।

বিল্টু-মন্টুদের বাড়ি গেলে ফুটবল খেলার কথা একদম বলতে পারবে না। সেজদাদুর কড়া নির্দেশ। তবে ক্রিকেট নিয়ে যতো খুশি আলোচনা চলবে। কারণ এক দিনের ক্রিকেটে ভারত এখন নিঃসন্দেহে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন।

তালতলার বিরুদ্ধে গোল করছেন ইস্টবেঙ্গলের বিশ্বজিত ভট্টাচার্য। দেখছেন জামশেদ।

শিবঠাকুর সারা মাঠে অনেকক্ষণ ধরে ঘুরে বেড়িয়েছিলেন। ওঁর কাছে কেউ ঘেঁষছে না। সকলে ভয় পাচ্ছে সাপটাকে। ওদিকে ওঁর ইচ্ছে খেলোয়াড়দের কাছে গিয়ে তাঁদের অভিনন্দন জানানোর, আশীর্বাদ করার। কিন্তু ওঁকে দেখেই খেলোয়াড়রা ছুটে পালাচ্ছে। শেষ কালে শিবঠাকুরের ভয়েই খেলোয়াড়রা ছুটে তাঁবুতে চলে গিয়েছিলেন।

সেই গল্প স্যার ক্লাসে বলেন আর সকলে হেসে গড়িয়ে যায়। নন্টে-ভন্টেদের ইচ্ছে, ওরাও মাঠে একবার যেন

এর পরের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা ভারত আর পাকিস্তানে হবে। ১৯৮৭ সালে এই প্রতিযোগিতা হবে বলে চারদিকে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। কলকাতায় হবে ফাইনাল খেলাটি । সেই খেলার জন্যে এখন থেকেই টিকিট চাওয়া শুরু হয়ে গেছে। ইডেনের প্রস্তুতিও শুরু হয়ে গেছে। ক্লাব হাউজ বড় করা হবে। গ্যালারি বাড়বে। বিদেশী টি ভির জন্যে আলাদা আলাদা ব্যবস্থা করা হবে। সব মিলিয়ে এক এলাহী ব্যাপার। তাই এখন থেকে ইডেনে ক্রিকেট ছাড়া আর কোনো খেলা

টেলা হবে না। আর ইডেনের কর্তৃত্ব পুরোপুরি সি. এ. বি.র।

১৯৮৭ সালের বিশ্বকাপ ক্রিকেট প্রতিযোগিতায় ভারত, পাকিস্তান, ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ইংলন্ড, নিউজিল্যান্ড আর শ্রীলংকা তো খেলবেই–এ ছাড়া জিম্বাবুয়ের মতো কোনো দল যোগ্যতা অর্জন করলে মূল পর্বে খেলার সুযোগ পাবে।

জুন-জুলাই মাসে বরাবরই খেলার জগৎ মেতে ওঠে।

রাজস্থানের বিরুদ্ধে গোল করছেন মহামেডানের নরিন্দর থাপা

এবার তো ইংলন্ডে এই মুহূর্তে অ্যাসেজ লড়াই অর্থাৎ ইংলন্ডের সংগে অস্ট্রেলিয়ার টেস্ট খেলা হচ্ছে। একই সংগে জমে উঠেছে উইম্বলডন টেনিস প্রতিযোগিতা। এই লেখা ছাপা হবার অনেক আগেই অবশ্য ওসব চুকে বুকে যাবে। তবে অ্যাসেজ লড়াই আর উইম্বলডন টেনিস হলেই সারা বিশ্ব সেদিকে তাকিয়ে থাকে। ছোট বড় সকলেই খোঁজ খবর নেন।

এবারের মরশুমের আগে ইংলন্ড অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ২৫৯টি টেস্ট খেলা হয়েছে। তার মধ্যে ইংলন্ড ৮৩ ও অস্ট্রেলিয়া ৯৫টি টেস্টে জিতেছে। দু দেশ অস্ট্রেলিয়ায় খেলেছে ১৩৪টি টেস্ট। এর মধ্যে ইংলন্ড ৪৯ ও অস্ট্রেলিয়া ৬৬টি টেস্টে জিতেছে। বাকি ১৯টি শেষ হয়েছে অমীমাংসিতভাবে। ইংলন্ডের মাটিতে দু দেশ খেলেছে ১১৭টি টেস্ট। এর মধ্যে ইংলন্ড ৩৪ ও অস্ট্রেলিয়া ২৯টি টেস্টে জিতেছে। বাকি ৫৪টি টেস্টের কোনো মীমাংসা হয় নি।

দু দেশের মধ্যে ব্যক্তিগত সর্বোচ্চ রান করেছেন ইংলন্ডের লেন হাটন। ওভাল মাঠে ১৯৩৮ সালে তিনি ৩৬৪ রান করেছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার পক্ষে সর্বোচ্চ রান ডন ব্রাডম্যানের। ১৯৩০ সালে লিডসে তিনি ৩৩৪ রান করেছিলেন।

এক ইনিংসে সেরা বোলিং করেছেন ইংলন্ডের জিম লেকার। ১৯৫৬ সালে তিনি ম্যানচেস্টার টেস্টে ৫৩ রানে ১০টি উইকেট পেয়েছিলেন। এই টেস্টে লেকার ৯০ রানে ১৯টি উইকেট পেয়েছিলেন।

হেড করার কায়দা

[ফ্রাংক বেকেনবাউয়ার মস্ত খেলোয়াড়। উনি কি করে খেলেন সেই কথাই বলেছেন ছোটদের। ওঁর কথা শুনে খেলা শিখলে তোমরাও ভালো খেলতে পারবে। আগের ক'য়েকটি সংখ্যায় বেকেনবাউয়ার ফুটবল খেলা শেখার ব্যাপারে অনেক কথা বলেছেন। এবার বলছেন হেড করার কায়দার কথা।]

ফুটবল খেলা শুধু মাটিতেই হয় না। শূন্যেও চলে খেলা। বলে মাথা ছুঁইয়েই অনেক সময় খেলার চরিত্র পুরোপুরি বদলে দেওয়া যায়। হেড দিয়ে গোল করে অনেক খেলারই মীমাংসা হয়েছে। সব দলেই তাই এখন এমন খেলোয়াড় চায় যারা খুব সুন্দরভাবে হেড দিতে পারে। কারণ ফুটবল খেলায় 'হেডের' গুরুত্ব খুবই বেশি।

অনেক সময় পরিকল্পনা মাফিক বল প্রতিপক্ষ দলের গোলের সামনে উঁচু করে ফেলা হয়। এখন হেড দিয়ে গোল করানোর চেষ্টা চলে। আক্রমণের বেলায় যেমন, আত্মরক্ষার ব্যাপারেও তেমনি হেড দিয়েই অনেক দুরূহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করা যায়।

তাই প্রত্যেক ফুটবল খেলোয়াড়ের হেড দেবার কায়দাটা ভালোভাবেই রপ্ত করা দরকার। নিখুঁতভাবে

হেড দিতে হলে দীর্ঘ অনুশীলনের দরকার। শরীরটাকে সবল ও সুস্থ রাখতে হবে। অবশ্য পুরোপুরি ফিট না হলে ভালোভাবে তো ফুটবল খেলাই যায় না।

ছবিগুলো ভালোভাবে লক্ষ্য করো। পর পর দেখলে বুঝতে পারবে কিভাবে হেড দিতে হবে। আসলে হেড দেবার ব্যাপারে সময় জ্ঞানটার দরকার সব থেকে বেশি। একটুখানি এদিক ওদিক হয়ে গেলেই মুশকিল এখন।

প্রশ্ন হচ্ছে, কিভাবে হেড দেবে। ছবিগুলো যদি ভালোভাবে দেখে থাকো তাহলে খানিকটা বুঝেছো। কি করতে হবে দেখো–

(১) প্রথমে বলটা খুব ভালোভাবে লক্ষ্য করো। কত উঁচুতে, ঠিক কোথায় আছে দেখো,

(২) এবার বল লক্ষ্য করে লাফিয়ে ওঠো,

(৩) শূন্যে মুহূর্তের জন্যে স্থির হও,

(৪) শরীরটাকে ধনুকের মতো বেঁকিয়ে নিয়ে হেড দেবার জন্যে প্রস্তুত হও,

(৫) এবার ঠিক মুহূর্তে কপাল দিয়ে বলটাকে আঘাত করো,

চোখ কিন্তু এক মুহর্তের জন্যেও বলের ওপর থেকে সরবে না। চোয়াল শক্ত থাকবে। এবং তোমার ইচ্ছে মত দিকে হেড দিয়ে বলটা পাঠিয়ে দেবে। এটা প্রতিপক্ষ দলের গোলের দিকেও যেতে পারে, কিংবা রক্ষণভাগে বলটা ঐভাবে বিপদসীমার বাইরেও পাঠানো যেতে পারে।

এইভাবে কিছুদিন অনুশীলন করলেই দেখবে তুমি কি ঠিকভাবে হেড দিতে পারছো। কাউকে সংগী হিসেবে না পেলে কোনো উঁচু পাঁচিলের ধারে গিয়েও অনুশীলন করতে পারো।

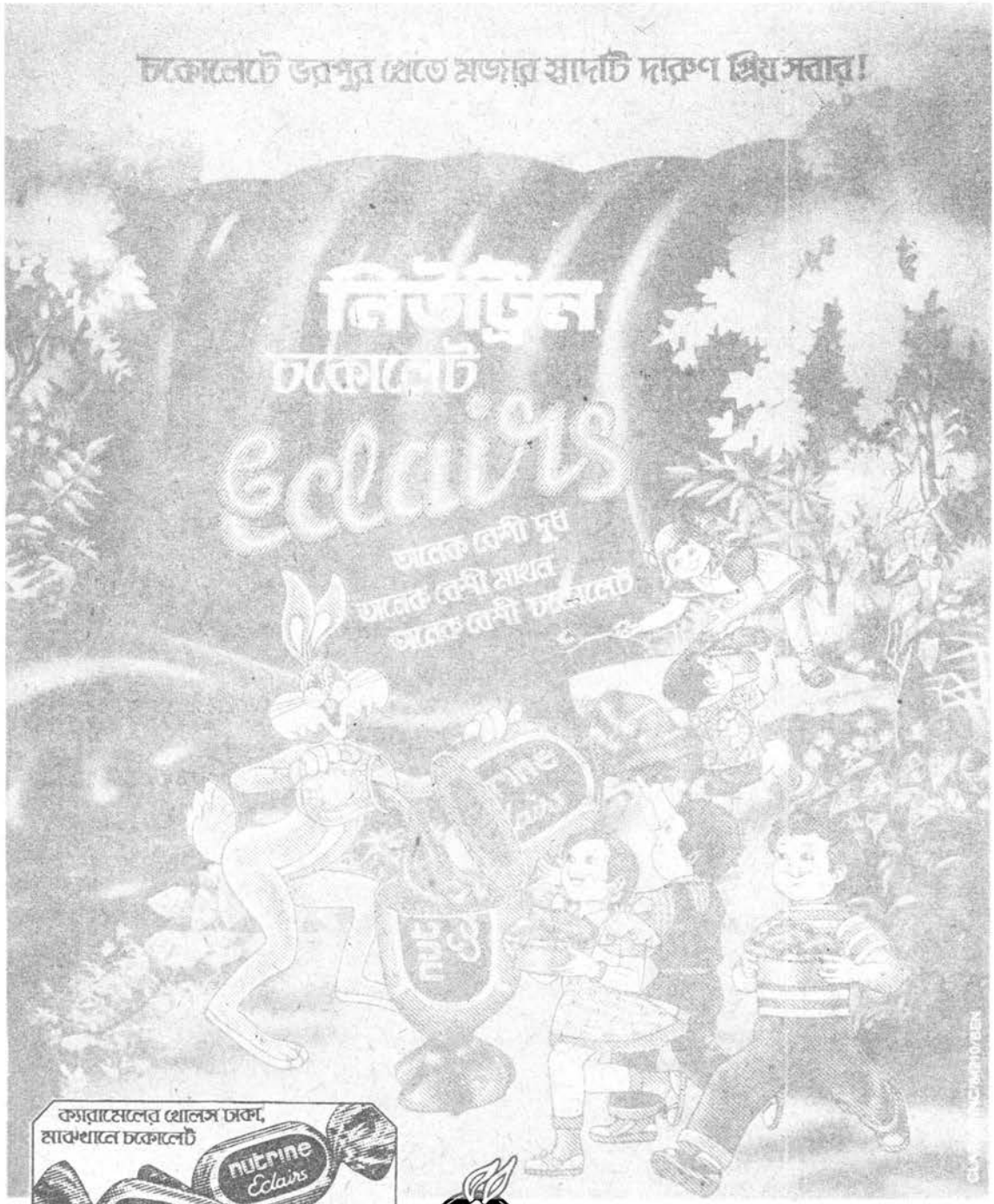

চকোলেটে ভরপুর খেতে মজার স্বাদটি দারুণ প্রিয় সবার!
নিউট্রিন
চকোলেট
Eclairs
অনেক বেশী দুধ
অনেক বেশী মাখন
অনেক বেশী চকোলেট
ক্যারামেলের খোলস ঢাকা,
মাঝখানে চকোলেট
nutrine
Eclairs
প্রতিটি সুইট গ্রাসে
দ্বিগুণ মজার ঠাসা
nutrine ভারতের সবচেয়ে বেশী বিক্রীর সুইট
নিউট্রিন কন্‌ফেকশানারী কোং প্রাঃ লিঃ, চিত্তুর, অ.প্র.

মহামেডানের খেলোয়াড় নাইজিরিয়ার চিমা।
ছবি ঃ সুমন চট্টোপাধ্যায়।

স্পোর্টস কুইজ

প্রশ্ন

১) শেষ প্রাচীন ওলিম্পিক কোন সালে হয়েছিলো ?
২) প্রাচীন ওলিম্পিক বন্ধ করার নির্দেশ কে দিয়েছিলেন ?
৩) প্রথম আধুনিক ওলিম্পিক হয়েছিলো যেখানে সেই স্টেডিয়ামটির নাম কি ?
৪) ব্যাডমিন্টনের সাটলককের ওজন কতো ?
৫) বাস্কেটবল খেলার উদ্ভাবক কে ?
৬) কোন সালে মুষ্টিযুদ্ধ ওলিম্পিকে অন্তর্ভুক্ত হয় ?
৭) বিদেশে বসবাসকারী একমাত্র চীনা খেলোয়াড় কে যিনি টেস্ট খেলেছেন ?
৮) সব চেয়ে বেশি বয়সে টেস্ট খেলেছেন কে ?
৯) টেস্ট ক্রিকেটে সব থেকে কম স্কোর কতো ?
১০) টেস্ট ক্রিকেটে কনিষ্ঠতম অধিনায়ক কে ?
১১) বিশ্বের প্রাচীনতম ফুটবল ক্লাব কোনটি ?
১২) ডুরান্ড কাপের খেলা কোথায় প্রথম শুরু হয়েছিলো ?
১৩) ডুরান্ড ট্রফিটি কার নামে ?
১৪) কোন ভারতীয় ফুটবল খেলোয়াড় প্রথম পদ্মশ্রী হন ?
১৫) ফুটবল খেলার ধারা বিবরণ প্রথম কবে প্রচারিত হয়েছিল ?
১৬) আধুনিক হকির জন্মস্থান কোন দেশ ?
১৭) সিংগলস খেলার সময় টেনিস কোর্টের মাপ কতে ?
১৮) ডেভিস কাপের সরকারী নাম কি ?
১৯) টেনিসে কোন খেলোয়াড় প্রথম গ্র্যান্ড স্ল্যাম পা৽?
২০) ভারতের প্রথম ফুটবল ক্লাবের নাম কি ? কোন সালে প্রতিষ্ঠিত হয় ?

উত্তর :

১) ৩৯৪ এ ডি।
২) রোম সম্রাট থিওডোসিয়াস।
৩) প্যান অ্যাথেনিক স্টেডিয়াম–এথেন্স।
৪) ৭৩.৮৫ গ্রেনস।
৫) আমেরিকার ডাঃ জেমস নাইস্মিথ।
৬) ১৯০৪ সালে।
৭) এলিস চ্যাং (ওয়েস্ট ইন্ডিজ)।
৮) ডব্লিউ রোডস কিংসটনে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে। ৫২ বছর ১৬৫ দিন তখন তাঁর বয়স।
৯) ২৬ রান। ইংলন্ডের বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ড ১৯৫৪-৫৫ সালে অকল্যান্ড টেস্টে করেছিলো।
১০) মনসুর আলি পতৌদি। ১৯৬২ সালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে তিনি যখন ভারতীয় দল পরিচালনা করেছিলেন তখন তাঁর বয়েস মাত্র ২০।
১১) শেফিল্ড ফুটবল ক্লাব–ইংলন্ড। ১৭৫৭ সালের ২৪ অক্টোবর প্রতিষ্ঠিত হয়।
১২) ১৮৮৮ সালে সিমলায়।
১৩) স্যার মার্টিমার ডুরান্ডের নামে।
১৪) গোষ্ঠ পাল।
১৫) ১৯২৮ সালে এফ এ কাপের ফাইনালের ধারাবিবরণ প্রথম রেডিও থেকে প্রচারিত হয়েছিল।
১৬) ইংলন্ড।
১৭) ৭৮ ফুট লম্বা ২৭ ফুট চওড়া।
১৮) ইন্টারন্যাশানাল লন টেনিস চ্যাম্পিয়নশিপ।
১৯) ডোনাল্ড বাজ (১৯৩৭-৩৮)।
২০) কলকাতার ডালহৌসি ক্লাব। ১৮৭৮ সালে।

মলটোভা দল
জীবন রক্ষার কৃতিত্বে উজ্জ্বল...

গ্রীষ্মের এক ভোরবেলা। ডাব্বু গুণগুণ করে গান গাইছে আর তার সাইকেলটাকে ঝকঝকে করে পালিশ করছে। ওদের মলটোভা দল মতলব করেছে যে এই আইঢাই গরমের হাত থেকে পালিয়ে দূরের পদ্ম-দীঘিতে জল তোলপাড় করে আজ মনের আনন্দে সাঁতার কাটবে। ডাব্বুর মা চেঁচিয়ে বললেন "ওরে ডাব্বু,বড় ফ্লাস্কটা ভরে গরম-গরম মলটোভা আর খাবার-দাবার নিয়ে যেতে ভুলিস না!"

ব্যস, মলটোভা দলের সব্বাই জড়ো হয়ে, ক্রিং-ক্রিং বেল বাজিয়ে সাইকেল নিয়ে শন্‌শন্ বেগে বেড়িয়ে পড়ল। ভোরের ঠাণ্ডা বাতাস, কোকিলের কুহু-কুহু ডাক, চারিদিকে পাকা আমের মৌ-মৌ গন্ধ, আহা, কি চমৎকার দিনের শুরু। ওরা এক ঝাঁক পায়রার মত যেন উড়ে চলল আর সঙ্গে কোরাসে গান ধরল "আমরা মলটোভা দল, বাঁধন ছেঁড়ার জয়গানে উদ্দাম চঞ্চল।

হঠাৎ ছন্দপতন

হঠাৎ দুম্ করে এক আওয়াজ। ওরা ভাবল খেয়েছে, ডাব্বুর সাইকেলের টায়ার বোধ হয় ফেঁসেছে। ওরা সাইকেল ঘুরিয়ে ডাব্বুর কাছে এসে দেখে এক সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটেছে। একটা কালো গাড়ি দুর্দান্ত স্পীডে চলতে গিয়ে এক সাইকেল আরোহীকে ধাক্কা মেরে, ধোঁয়া ছেড়ে পালাচ্ছে। ঐ ধাক্কার দুম্ করে আওয়াজটাই ওরা শুনেছে।

মলটোভা দল প্রাণরক্ষার কাজে চটপট

বেনু চেঁচিয়ে গাড়িটাকে থামাতে না পারলেও, গাড়ির নম্বরটাকে পড়ে নিয়েছে। দলের সর্দার ডাব্বু বলল "আমি আহত ছেলেটাকে দেখছি, তোরা সাহায্য কর। মিনির স্কার্টের পকেটে একটা আধুলি ছিল। মালতি সেটা নিয়ে অ্যাম্বুলেন্সে ফোন করতে ছুটল। ছেলেটার চোট খাওয়া স্থান থেকে ঝরঝর করে রক্ত পড়ছে। ডাব্বু বলল "ভাই একটু শান্ত হও, অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ল বলে।" ডাব্বু সেলিমকে বলল "আমায় বাঁধতে সাহায্য কর। দুজনে মিলে ছেলেটার রক্তঝরা শিরাটা চটপট্ বেঁধে দিল। রক্ত পড়াটা বন্ধ হতে সব্বাই নিশ্চিন্তের হাঁপ ফেলল। ডাব্বু ভাবল, ভাগ্যিস,স্কাউটে ফার্স্ট এডের কাজটা শিখে নিয়ে ছিলাম, সেটা এখন কাজে লেগে গেল।

অ্যাম্বুলেন্স এসে পড়ল

সাইরেন বাজিয়ে সাদা রঙের অ্যাম্বুলেন্স ভ্যানটা এসে পৌঁছতেই, ডাক্তারবাবু চটপট্ নেমেই কাজে লেগে গেলেন। পরে তিনি ডাব্বুকে ডেকে বললেন "আরে ভাই, তুমি তো ডাক্তারের মত পাকা হাতে কাজ করেছে। তোমার ঐ চটপট্ বেঁধে রক্তঝরা বন্ধ করার ফলে ছেলেটার জীবন বেঁচে গেছে। গাড়ির নম্বরটা টুকে নিয়েছে তো, ব্যস, বদমাইশ ড্রাইভারটাকে পুলিস পাকড়াবেই।" ডাব্বু বলল "না না ডাক্তারবাবু, কৃতিত্বটা আমার একার নয়, এই পুরো মলটোভা দলের!"

চমৎকার মলটোভা ··· যার জন্যে সবেতেই মজা আর মজা

আজ্ঞে হ্যাঁ, মলটোভায় বাড়ন্ত বাচ্চার দল, প্রাণ-প্রাচুর্যে উচ্ছল। কারণ, প্রতি কাপ মলটোভায় থাকে, সোনালী-দানার গম, বার্লি, খাঁটি দুধ, পুষ্টিকর কোকো আর চিনির ভরপুর গুণ। বাচ্চাদের নিয়মিত মলটোভা দিন, আর দেখুন, ওরা কেমন বাড়তি প্রাণ-প্রাচুর্যে, রোগ প্রতিরোধের বাড়তি ক্ষমতা আর দারুণ স্ট্যামিনা নিয়ে সবল স্বাস্থ্যে তরতরিয়ে বাড়তে থাকে। মলটোভা···আপনার বাড়ন্ত বাচ্চাদের প্রাণ-প্রাচুর্যের খনি।

মজার মলটোভা ক্লাবে যোগ দাও।

যোগ দেয়া খুবই সোজা!
কেবল এর ৫০০ গ্রামের শিশির তিনটি লেবেল ও ভেতরের সীল বা ৫০০ গ্রামের রিফিল প্যাকের তিনটে ওপরের ফ্ল্যাপ এখানে পাঠিয়ে দাও:

দি মলটোভা ক্লাব
৪-র্থ তলা, ভাণ্ডারি হাউস
৯১, নেহেরু প্লেস, দিল্লী ১১০ ০১৯।

ব্যস, তুমি দলে ঢুকে পড়লে!

JIL জগৎজিত ইণ্ডাস্ট্রীজ লিমিটেড

ভিটামিনে ভরপুর মলটোভা: স্বাস্থ্য, শক্তি ও উদ্যমের জন্যে

SIMOES/JIL/003/85 BEN

ক্রিকেটের লর্ড-ক্লাইভ

(চার)

ক্লাইভ যখন খুব ছোট তখন বার্বাডোজ থেকে ওর মাসী আর তাঁর ছেলে ওদের ওখানে এসেছেন। ক্লাইভদের খুব কাছেই একটা বাড়ি ভাড়া নিয়ে ওঁরা থাকেন। মাসীমার সংগে গল্প করেন। আর দশ বছরের বড় দাদা ল্যান্স দিব্যি মিশে গেলো ওদের সংগে।

ভীষণ রোগা ক্লাইভের দাদা ল্যান্স। একটু লম্বাটে। এই দাদাকে নিয়ে ক্লাইভের গর্বের অন্ত নেই। কি সুন্দরই না বল করে। বলগুলো বন বন করে ঘোরে। ল্যান্সের স্পিন বলের সংগে কেউ এঁটে উঠতে পারে না। ক্লাইভদের বাড়ির সামনে খেলতে নেমেই ল্যান্স ভেলকি দেখায়।

লয়েড ভাবতো, ওর দাদা খুব তাড়াতাড়ি নাম করে ফেলবে। হলোও তাই। ক'য়েক মাসের মধ্যে ভালো স্পিন বোলার হিসেবে ছড়িয়ে পড়ল ল্যান্স গিবসের নাম। জর্জটাউনের সব থেকে বড় ক্লাব ডেমেরারা। ল্যান্স গিবস এবার বোধহয় ঐ ক্লাবেই খেলবে।

ক্লাইভদের বাড়ির খুব কাছেই রবার্ট ক্রিস্টিয়ানি থাকেন। এক সময় খুব নামকরা খেলোয়াড় ছিলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজের পক্ষে টেস্ট খেলেছেন। ক্লাইভরা রেডিওয় ওঁর নাম শুনেছে। কাগজে পড়েছে ওঁর কথা। ওদের কাছে উনি যেন এক স্বপ্নে দেখা রাজপুত্র। বয়েসটাই যা বেড়ে গেছে। ক্লাইভ মাঝে মাঝেই ওঁর বাড়ির আশেপাশে ঘুরঘুর করে। আসলে ওঁকে দেখতে চায়। কিন্তু কাছে যেতে ভয় পায়। যদি কিছু বলেন।

সেবার ওদের দারুণ উত্তেজনা। ক্লাইভরা ছটফট করছে। পাকিস্তানের সংগে ওয়েস্ট ইন্ডিজের টেস্ট খেলা বোউরদার মাঠে। মাঠের চারপাশ ছোট বড় গাছে ভরা। খেলার দিন সকালবেলায় ক্লাইভরা মাঠে ছুটলো। ওদের দলের সবাই এক সংগে। ওদের আগেই অনেকে পৌঁছে গেছে। গাছে উঠে জুত করে বসেছে। ক্লাইভরাও একটা গাছ বেছে নিয়ে উঠে পড়লো। মাঠ ভরা, গাছ ভরা। একটু পরেই খেলা।

পাঁচটা দিন যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো ওরা বুঝতেই পারলো না। দারুণ খেলা হলো। গ্যারি সোবার্স সেঞ্চুরি করলেন। ওয়েস্ট ইন্ডিজ হারিয়ে দিলো পাকিস্তানকে। ক্লাইভের সেই প্রথম টেস্ট খেলা দেখা। শুধু তাই নয়–সে দেখেছে তার প্রিয় ব্যাটসম্যান গ্যারি সোবার্সের খেলা।

একটা ঘোরের মধ্যে ছিলো ক্লাইভ। বাড়ি ফিরেও তা কাটতো না। চোখের সামনে সব সময় ভাসছে সোবার্সের খেলা। গ্যারি কি করে ব্যাট ধরেন, কি ভাবে ব্যাট চালান, বাউন্ডারি হাঁকান–সব যেন মুখস্থ করে ফেলেছে ক্লাইভ। মস্ত বড় ভারী ব্যাটটা নিয়ে গ্যারি সোবার্সের মতো ব্যাট করতে চেষ্টা করে ক্লাইভ।

টেস্ট ম্যাচের সময় আরও কতো নামকরা খেলোয়াড়ই তো দেখলো ক্লাইভ। কিন্তু ওকে বিভোর করে রাখলেন গ্যারি সোবার্স। গ্যারি ওর হিরো। ওর আদর্শ। বড় হয়ে ও গ্যারির মতো খেলোয়াড় হতে চায়।

ক্লাইভদের স্কুলের স্পোর্টস।, ক্লাইভ তখন ফাউনটেন এ.এম. ই. পাবলিক স্কুলে পড়ে। বাড়ির কাছে স্কুল। স্কুলের পাশে বড় মাঠ। সেখানে খেলে ক্লাইভরা। স্পোর্টস আসছে। ক্লাইভ সকাল বিকেল ঐ মাঠে গিয়ে পাঁই পাঁই করে ছুটছে। কখনো লং জাম্প, হাই জাম্প প্র্যাকটিশ করছে। স্কুলের স্পোর্টসে অনেকগুলো প্রাইজ ও পাবেই। শুধু তাই নয় গায়নার আন্তঃস্কুল অ্যাথলেটিকস প্রতিযোগিতা থেকে ক্লাইভ লয়েড প্রত্যেক

বছরই ওদের স্কুলকে অনেকগুলো করে প্রাইজ এনে দেয়।

কিন্তু তাতে মন ভরে না স্লাইভের। তেমন আনন্দও পায় না। ওর মনে হয় এর চেয়ে যদি একটা বাউন্ডারি হাঁকাতে পারতো কিংবা একটা ক্যাচ লুফতে পারতো তাহলে সে অনেক বেশি আনন্দ পেতো। আসলে ক্রিকেটই যে ওর প্রাণ।

ওদিকে স্লাইভের মাসতুতো দাদা ল্যান্স গিবস জর্জটাউনের সব থেকে বড় ক্লাব ডেমেরারায় চান্স পেয়ে গেছে। দাদার সংগে ও হাজির হতো মাঠে। ওদের পেছনে পেছনে বন্ধুরাও যেতো। ওরা বসে বসে খেলা দেখে। কখনো ছুটোছুটি করে।

প্রত্যেক শনি আর রবিবারে আন্তঃ ক্লাব ক্রিকেট প্রতিযোগিতার খেলা হয়। ল্যান্স ডেমেরারার হয়ে খেলতে নামে। স্লাইভের তখন যেন ব্যস্ততার শেষ থাকে না। দাদার জিনিসপত্তর আগলাচ্ছে। আবার কখনো বরফ আনতে ছুটছে, জল দিচ্ছে, স্কোর লিখছে আরও কতো কি করছে।

কিন্তু চোখ দুটো ওর সব সময় মাঠের দিকে। গায়নার নামকরা সব খেলোয়াড়রা খেলছেন। ওঁদের খেলা যেন গিলছে ও। আর ওর দাদার বলে কেউ আউট হলে আর দেখতে হবে না। হাত-পা তুলে নাচতে শুরু করবে'ও। আনন্দে ডিগবাজি খাবে। তখন ওকে সামলানোই মুশকিল।

অন্যদিন নেট প্র্যাকটিশের সময় স্লাইভ কাছে কাছেই থাকে। বল কুড়িয়ে দেয়। ফাইফরমাস খাটে। ওর সব সময় ইচ্ছে করে বড়দের মতো ব্যাট হাতে নিয়ে গিয়ে নেটের মধ্যে দাঁড়াতে। কিন্তু সে সুযোগ আর ও পায় না। বড্ড ছোট। তাই কেউ ব্যাট করতে দেন না। তবে কখনো সখনো বল করে।

তবে ওদের স্কুলের টিমের ও ক্যাপটেন হয়েছে। দিব্যি খেলছে। স্লাইভ তখন চেথাম হাইস্কুলে পড়ে। জর্জটাউনের আন্তঃ স্কুল ক্রিকেট প্রতিযোগিতা হলো চিন কাপের খেলা। স্লাইভের নেতৃত্বে চেথাম স্কুল দারুণ খেলছে। স্লাইভ গাদা গাদা রান করছে। উইকেটও পাচ্ছে। স্কুলের মাস্টারমশাই আর ছাত্রদের কাছে ওর দারুণ নাম। এক ভাবে স্কুলসুদ্ধ সক্কলে ওকে চেনে। খেলার দিন দল বেঁধে সকলে যায়। চিৎকার, হৈ চৈ চলে সারাদিন ধরে। চেথাম জিতলে তো আর কথাই নেই। তা প্রায়ই চেথাম স্কুল জিতে যায়। সেদিন আনন্দ আর

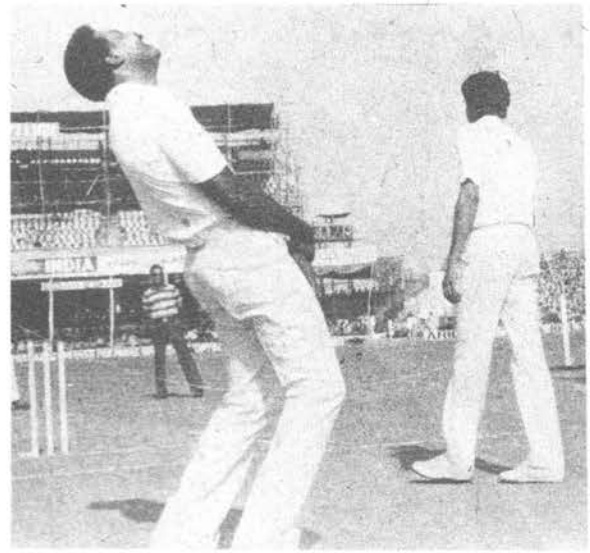

নাচানাচির জের চলে পরদিন স্কুল পর্যন্ত। সেই আনন্দ উৎসবের মধ্যমণি হয় স্লাইভ লয়েডই।

কিন্তু মন ভরে না স্লাইভের। সে আরও বড় কিছু করতে চায়। বড়দের প্রতিযোগিতায় খেলতে চায়। চৌদ্দ বছরের স্লাইভ লয়েডের চোখে স্বপ্ন। সে দাদার সংগে বড় মাঠে খেলতে চায়। নামকরা খেলোয়াড়দের পাশে খেলে সেও নামকরা খেলোয়াড় হতে চায়।

ল্যান্সকে সে কথা বললেই হেসে ওঠে গিবস। বলে, দাঁড়া, দাঁড়া আর একটু বড় হ'। আমি তোর থেকে দশ বছরের বড়। অতটা না হলেও আর একটু বড় হ'। তা না হলে তোকে তো বড়দের সংগে খেলতেই দেবে না।

তবু আশা ছাড়ে না স্লাইভ। দাদার সংগে প্রায়ই যায় বড় মাঠে। প্র্যাকটিসের সময় পাশাপাশি থাকে । বলটল কুড়িয়ে দেয়। খেলোয়াড়রা ওকে পছন্দই করেন।

পড়াশোনা, স্কুলের খেলা, বড়দের পাশাপাশি থাকা আর ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখে দিব্যি কেটে যাচ্ছিলো স্লাইভ লয়েডের দিন। ভাবতো, এইভাবে আর দু এক বছর কাটাতে পারলেই ও হয়তো বড়দের সংগে খেলার সুযোগ পেয়ে যাবে।

মানুষ ভাবে এক–হয় আর এক। স্লাইভের নিশ্চিন্ত জীবনে হঠাৎই যেন বিনা মেঘে বজ্রপাত হলো।

হঠাৎ মারা গেলেন স্লাইভের বাবা....।

(চলবে)

গল্প নয় সত্যি

এক হিটে ৪৭ রান!

গল্প নয় সত্যি ঘটনা। ঘটেছিলো ১৮৮৩ সালে। ইংলন্ডের কেন্টের চেথাম লাইনসে এই কান্ডটা হয়েছিলো। একদল আগে ব্যাট করতে নেমে ৪৬ রানে তাদের ইনিংস শেষ করেছিল। প্রতিপক্ষ দল ব্যাট করতে নামলো।

মাঠটা একটু উঁচু জায়গায়। পাশে ব্রুক টিলা। ব্যাটসম্যান মারতেই বলটা সেই ছোট্ট পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নিচের দিকে নেমে যেতে লাগলো। বেশ ক'য়েক জন ফিল্ডার ছুটলেন বলের পেছনে।

ওদিকে ব্যাটসম্যানরা রান নিয়েই চলেছেন। শেষ পর্যন্ত বলটা ধরলেন একজন ফিল্ডার। অন্যরা লাইন করে দাঁড়িয়ে গেলেন। রিলে প্রথায় বলটা ছুঁড়ে দেওয়া হতে লাগলো। কিন্তু এক একবার ফিল্ডারদের হাত থেকে বল পড়ে যেতেই আবার সেটি গড়িয়ে নিচের দিকে চলে যায়। এই ভাবে বার ক'য়েক ক্যাচ ফস্কানোর পর বলটা যখন ফিরে এলো ততক্ষণে দুই ব্যাটসম্যান ছুটে ৪৭ রান নিয়ে নিয়েছেন। খেলাও শেষ। তখন অবশ্য লস্ট বল, ডেড বল এই সব নিয়ম হয় নি।

* * *

সব থেকে দূরে বল মারার রেকর্ডের অধিকারী ওয়ালটার ফেলোস। ১৮৫৬ সালে তিনি রেকর্ডটা গড়েছিলেন। আজও কেউ তা ভাঙতে পারেন নি। অক্সফোর্ডের ক্রাইস্টচার্চ মাঠে তিনি মারার পর বলটা গিয়ে পড়েছিলো ১৭৫ গজ দূরে।

* * *

সিডনি মাঠে প্যাভিলিয়নের মাথায় একটা বড় ঘড়ি বসানো হয়েছে ১৯৭১ সালে। ঘড়িটা বসানোর পর ঘোষণা করা হলো যে ব্যাটসম্যান খেলার সময় বল মেরে এই ঘড়িটি ভাঙতে পারবেন তাঁকে দু হাজার পাউন্ড পুরস্কার দেওয়া হবে। কিন্তু আজও কেউ তা পারেন নি। দেখা যাক পুরস্কারটি শেষ পর্যন্ত কারো কপালে জোটে কিনা!

তোমাদের ??? জিজ্ঞাসা

অঞ্জন বসু (কামরাংগা, সোনারপুর, ২৪ পরগণা) ও সুখেন্দু বিকাশ চৌধুরী (এ. এল. আর ২৫, দুর্গাপুর) ও নির্মল বিশ্বাস (সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল, সাহেবগঞ্জ,বিহার)।

উত্তর : ছাপার গোলমালে ঐ কান্ড হয়েছে। প্রশ্ন ছিলো টেস্ট ক্রিকেটে দু ইনিংসেই কেউ দশটি করে উইকেট পেয়েছেন কিনা। তা তো পান নি। জিম লেকার এক ইনিংসে ১০টি উইকেট পেয়েছেন। সে কথা এই সংখ্যাতেও আছে। চিঠির জন্য ধন্যবাদ।

শম্পা রায় ও শান্তিরঞ্জন দে (তিলজলা, কলকাতা৩৯)

প্রশ্ন : বিশ্বনাথ কোথায় কোন দেশের বিরুদ্ধে প্রথম টেস্ট খেলেন?

উত্তর : কানপুরে, অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে।

সুদীপ্ত কুমার প্রামাণিক (আশানন্দ পাতা স্ট্রীট, শান্তিপুর, নদীয়া)

উত্তর : শুকতারায় এখন তো শেষ প্রচ্ছদে খেলোয়াড়দের রঙিন ছবি থাকছে। অন্য প্রশ্নগুলির উত্তর আগেই ছাপা হয়েছে।

চিত্তরঞ্জন মন্ডল (রাজা রাজকৃষ্ণ স্ট্রীট, কলকাতা-৬)

প্রশ্ন : বর্তমান বিশ্বের দ্রুততম বোলার কে?

উত্তর : ম্যালকম মার্শালের বলের জোরই সব থেকে বেশি। জোয়েল গারনার তাঁর কাছাকাছি।

রাজা রায় (এফ. সি. আই, দুর্গাপুর)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে ক'জন ব্যাটসম্যান ২০টি বা তার বেশি সেঞ্চুরি করেছেন?

উত্তর : নজন।

গাভাসকার(৩০টি),ব্রাডম্যান (২৯), সোবার্স (২৬), গ্রেগ চ্যাপাল (২৪), হ্যামন্ড (২২), কলিন কাউড্রে (২২), জিওফ বয়কট (২২), নিল হার্ভে (২১), কেন ব্যারিংটন (২০)।

মেনি মন্ডল (লেক টাউন, কলকাতা)

প্রশ্ন : টেস্ট ক্রিকেটে অস্ট্রেলিয়ার সব থেকে কম রান কতো?

উত্তর : ৩৬, ইংলন্ডের বিরুদ্ধে বার্মিংহামে ১৯০২ সালে।

এই সংখ্যার সব ছবি সুমন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা।

অলৌকিক

নন্দলাল ভট্টাচার্য

মা, মা, দেখ।

মা তখন ব্যস্ত ছিলেন রান্নাঘরে, তাই ছেলের কথায় একটু বিরক্ত হয়েই বলেন, কী, কী দেখব?

দেখই না আগে।

ছেলের দিকে তাকিয়েই মায়ের আক্কেল গুড়ুম। তিনি হাসবেন, না কাঁদবেন বুঝে পান না। শুধু অবাক কণ্ঠে বলেন, এ কিরে, ভূতের মতন এ কি সেজেছিস?

ভূত কোথায়? আমি তো সাধু সেজেছি।

সাধু সেজেছিস? তা তোর জামাকাপড় গেল কোথায়?

কেন, সেগুলো পুড়িয়েই তো ছাই করেছি।

সে কী? তুই কি পাগল হলি? মা এবার প্রায় কেঁদেই ফেলেন।

তা দেখে অবাক হয়ে পীতাম্বর বলে, বারে, তুমিই তো তখন বললে সাধু হতে।

আমি বললাম?

বললে না, পীতাম্বর, তুই লেখাপড়াও করছিস না, ঘরের কাজকর্মও কিছু দেখবি না, তবে কি তুই সাধু হবি?

মনে পড়ে মায়ের। বাপ-মরা ছেলের দুরন্তপনায় তিনি জেরবার হচ্ছেন। বয়স মাত্র বছর সাত। কিন্তু এরি মধ্যে তার দুরন্তপনায় অস্থির হয়ে উঠেছেন তিনি। দিনরাত্তির সে ঘুরে বেড়ায় বনে জঙ্গলে। এমন ছেলেকে নিয়ে তিনি কি করবেন? আজ সকালেও ঘটেছে একই ব্যাপার। দুদিন আগে যে বই কিনে দিয়েছেন তার কোনো পাত্তা নেই। তাই রেগেমেগেই ছেলেকে বলেছিলেন মা নর্মদা দেবী, হ্যাঁরে পীতাম্বর, তুই কি সাধু হবি?

পীতাম্বর সে কথা শুনে দু চোখ মেলে তাকিয়েছিল, তারপর চলে গিয়েছিল সেখান থেকে।

মা সেদিকে নজর দেন নি। ভেবেছিলেন, রোজ যেমন বেরিয়ে যায়, তেমনি হয়ত গেছে। কিন্তু ছেলে যে মনে মনে এই করবে ঠিক করেছে তা তিনি জানবেন কি করে? ছেলের যখন বছর চারেক বয়েস তখনই নর্মদাদেবী হারিয়েছেন স্বামীকে। বাপের বাড়িতেও বেটাছেলে বলতে কেউ নেই। তাই ছেলে পীতাম্বর দুই কুলেরই অতি আদরের। তাকে ঘিরে দু পক্ষেরই নানা আশা। কিন্তু পীতাম্বরের সেদিকে কোন হুঁশই নেই। সে আছে আপন খেয়ালে।

অবন্তিকা বা উজ্জয়িনীতে তাদের বাড়ি। বাড়ির চারিদিকে ছড়িয়ে আছে অতীতের নানা স্মৃতি। জঙ্গলে ঢাকা কালিয়া দীঘি, মহাকাল, কালভৈরবের মন্দির, ভর্তৃহরি গোরক্ষনাথের গুহা, শিপ্রা নদী সব সময় কাছে ডাকে পীতাম্বরকে। তাই তার সবচেয়ে প্রিয় জায়গা ওই বন, জঙ্গল। পড়াশোনায় এতটুকু মন নেই। জঙ্গলে ঘুরেই কেটে যায় তার সময়।

মাঝে মাঝে মা পড়ার জন্য বড় তাড়া দেয়। সেদিনও একটু মারধরই করেছিলেন ছেলেকে। মার খেয়ে অভিমান হয়েছিল পীতাম্বরের। বন থেকে বেশ কিছু বিষফল নিয়ে সেগুলো খেয়ে শুয়ে পড়েছিল এক পোড়ো বাড়িতে। ভেবেছিল, মরে গেলে বেশ হবে। মা আর তাকে পড়ার জন্য মারতে পারবে না। এইসব ভাবতে ভাবতে ঘুমিয়ে পড়েছিল পীতাম্বর। ঘুমের মধ্যেই দেখে সেই বেদে আর বেদেনীকে। শিব আর পার্বতী হয়ে তাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন। শিবের মুখে মিটিমিটি হাসি। তিনি বলেন, কীরে, মরবি ভেবেছিস? কিন্তু মরা তো হবে না। তুই যে আমার অংশে জন্মেছিস। জানিস না, আমি নীলকণ্ঠ।

একসময় ঘুম ভাঙে পীতাম্বরের। ভাঙা জানলা দিয়ে রোদ এসে পড়ে তার মুখে। ধড়ফড় করে উঠে পড়ে পীতাম্বর। তারপরই মনে পড়ে সে মরতে বসেছিল, কিন্তু মরেনি। শিব বলেছেন, তার নাকি শিবের অংশে জন্ম।

বরাহমিহিরের দেশ উজ্জয়িনীতে তখনও জ্যোতিষ-চর্চার ছিল খুবই প্রচলন। পীতাম্বরের জন্মের পরই গণকরা জাতকের কোষ্ঠী গণনা করে বলেছিলেন, শিবের অংশে জন্ম এই শিশুর। দীর্ঘজীবী, সত্ত্বগুণের অধিকারী শিশু ভবিষ্যতে হবে যোগীরাজ। আজ গণকদের সেই

গণনাই বোধহয় সত্যি হলো।

বনে বনে ঘোরার সময়ই পীতাম্বরের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল এক বেদে বেদেনীর। তারা ছেলের মতো ভালবাসত পীতাম্বরকে। হাতে ধরে সাপ ধরা শিখিয়েছিল তারা। শিখিয়েছিল কেমন করে জপতপ করতে হয়। তারপর একদিন তারা উধাও হয়ে যায়। যাবার আগে পীতাম্বরকে জানিয়ে যায়–তারা বেদে বেদেনী নয়, তারা শিব-পার্বতী।

এমনি ভাবে ছোটবেলা থেকেই ঈশ্বরের করুণা পেতে থাকে পীতাম্বর। ন'বছর বয়সে পৈতে হলো পীতাম্বরের। আর পৈতের দিন কয়েক বাদেই ব্রহ্মচারী অবস্থায় ঘর ছাড়ে পীতাম্বর।

পীতাম্বর শুনে এসেছিল নর্মদা পরিক্রমার চেয়ে বড় সাধনা নাকি আর কিছু নেই। এবার সেই সাধনাই শুরু করবে সে। বনে বনে ঘুরে, বেদে বেদেনীর কাছ থেকে সাপ ধরা শিখে ভয় কাকে বলে তা জানা নেই পীতাম্বরের। তার ওপর জানে মা নর্মদা তাকে রক্ষা করবেন যে কোনো বিপদ থেকে। তাই নির্ভয়ে শুরু করে সে নর্মদা পরিক্রমা।

পরিক্রমা পথেই পীতাম্বর পায় সাধক ব্রহ্মানন্দর কৃপা। তিনি দীক্ষা দেন পীতাম্বরকে। পূর্বাশ্রমের সব পরিচয় যায় তার মুছে। পীতম্বর হয় বালানন্দ–বালানন্দ ব্রহ্মচারী। নর্মদা পরিক্রমা করতে পীতাম্বরের লাগে প্রায় ন'বছর। এই পরিক্রমার সময় তার জীবনে ঘটেছে নানা অলৌকিক ঘটনা।

একদিন পথ চলতে চলতে সন্ধ্যে যখন নামে পীতাম্বর বা বালানন্দ ব্রহ্মচারী তখন এসে দাঁড়িয়েছেন গভীর এক বনের মধ্যে। সঙ্গে খাবার-দাবারও কিছু নেই। অথচ এতটা পথ চলে দারুণ ক্লান্ত। তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে তার ছাতি। বালানন্দ ভাবেন মা নর্মদার জল খেয়েই ক্ষুধা ও তৃষ্ণা মেটাবেন তিনি সেদিনের মতো।

হঠাৎ এমনি সময় কাছেই শোনা যায় গরুর গলার ঘন্টার আওয়াজ। যে পথ দিয়ে এসেছিলেন বালানন্দ সেই পথেই হঠাৎ হাজির হন এক ভীল রমণী, সঙ্গে তাঁর মহিষ। মহিষের দুধ দুয়ে লোটা ভরে দেন তিনি বালানন্দকে। তারপর যেমন এসেছিলেন হঠাৎ, তেমনি মিলিয়ে যান সেখান থেকে। বালানন্দ পরে জেনেছিলেন মা নর্মদাই এসেছিলেন ভীল রমণীর ছদ্মবেশে।

যাই হোক, পরিক্রমা চলে। ন'বছরের বালক পৌঁছোয় কৈশোরের কোঠায়। সেই সময় ঘটল আরেক অঘটন। পরিক্রমা তখনও শেষ হয়নি। বালানন্দের সঙ্গী রয়েছেন তখন আরেক সাধু। একদিন হঠাৎ এক জায়গায় একজন এসে বালানন্দকে বলে, এই চল তোমরা, ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব তোমাদের ডাকছে।

বালানন্দ বুঝে উঠতে পারেন না, ম্যাজিস্ট্রেট কেন তাঁকে ডাকছেন। যাই হোক, ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে আসতেই তিনি চেঁচিয়ে বলেন, এই তোমরা সাধু নও, তোমরা ডাকু।

বালানন্দ যত বোঝাতে যান, সাহেব ততই চিৎকার করে বলেন, না তোমরা ডাকু। দেখি তোমাদের ঝোলা।

নর্মদা পরিক্রমার সময় প্রতিটি সাধুর সঙ্গেই থাকে কন্দমূল খুঁড়ে বের করার জন্য একটা ছোট শাবল, ধুনির কাঠ কাটার জন্য ছোট টাঙ্গি আর কিছু গাঁজা ও শঙ্খ বিষ। বালানন্দর ঝুলি থেকেও সেগুলি বেরোতেই ম্যাজিস্ট্রেট চিৎকার করে বলেন, এই তো, এই বিষ খাইয়ে মানুষকে অজ্ঞান করে ওই শাবল এবং টাঙ্গি দিয়ে তোমরা তাকে কেটে পুঁতে ফেল।

বালানন্দ যত বলেন, না সাহেব, শীতের সময় গা গরম করার জন্য এই শঙ্খবিষ আমরা খাই আর শাবল টাঙ্গি

লাগে আমাদের কন্দমূল বের করতে আর কাঠ কাটতে। সাহের তত বলেন, সব বাজে কথা। তিনি বলেন, তোমাদের কথা যদি সত্যি, তাহলে ওই বিষ খেয়ে দেখাও তো।

কিশোর বালানন্দ ভাবেন, এই সাহেবের হাতে যখন পড়া গেছে তখন জেলে পচতে হবে নির্ঘাৎ। তার চেয়ে যা করেন মা নর্মদা। সবটা বিষই আমি খেয়েনি। ভেবেই একসঙ্গে সবটা শঙ্খবিষ খেয়ে নেন। জ্ঞান হারিয়ে লুটিয়ে পড়েন বালানন্দ।

ওদিকে ঠিক ওই সময়েই সাহেবের যুবক ছেলে ঘোড়ায় করে শিকার থেকে ফেরার সময় বার কয়েক বমি করে ধড়ফড়িয়ে মারা যায়। সবাই তখন সাহেবকে বলে, সাহেব, নির্দোষ সাধুদের আটক করার জন্যই এটা হয়েছে। এদের আপনি ছেড়ে দিন। না হলে আরো বিপদ হবে। সাহেবও ততক্ষণে হয়ত বুঝতে পেরেছেন সব। মুক্তি দেন তিনি ওদের আর যে ডাক্তার এসেছিলেন তিনি একটু চিকিৎসা করতেই জ্ঞান ফিরে আসে বালানন্দর। তিনি শোনেন সব, বোঝেন মা নর্মদাই তাঁকে রক্ষা করেছেন, না হলে অতটা শঙ্খবিষ খেয়ে বাঁচা সম্ভব নয়।

পরবর্তীকালে বালানন্দ ব্রহ্মচারীর জীবনে ঘটেছে আরও অনেক অলৌকিক ঘটনা। দেওঘরে তিনি প্রতিষ্ঠা করেন আশ্রম এবং সেখানেই তিনি দেহত্যাগ করেন। তাঁর বাবার কথা তেমন জানা যায় না। শুধু জানা যায় তিনি ছিলেন নিষ্ঠাবান এক ব্রাহ্মণ এবং শিবের আরাধনা করেই পুত্ররূপে তিনি পেয়েছিলেন তাঁর পীতাম্বরকে—উত্তরজীবনের বালানন্দ ব্রহ্মচারীকে।

ছাপাখানার স্বর্ণ সুযোগ

স্থাপিত : ১৯০৭ সব থেকে দৃঢ় ও দীর্ঘস্থায়ী টাইপ ফোন : ৩৫-৪২৯৫

অসমীয়া, হিন্দী, ইংরেজী, বাংলা, মারাঠি, নাগা

প্রভৃতি টাইপ বিভিন্ন আকারে পাওয়া যায়

বরদা 18 pt.	বরদা 16 pt.	বরদা 12 pt.	God 12 pt.	God 14 pt.	অমল 16 pt.	অমল 18 pt.	অমল 12 pt.	NUN 12 pt
জয়ন্তী	আরতী	পাইকা	চেল্ট বোল্ড কন্	গিল কণ্ড	হিন্দী	হিন্দী	হিন্দী	নাগা
বরদা N. S. P.	বরদা 14 pt.	বরদা Great Ant.	GOD 10 pt.	God 12 pt.	অমল 16 pt.	অমল 18 pt.	অমল 12 pt.	nun 12 pt.
নিউ স্মল	চিত্রা	গ্রেট এন্টিক	কার্টন	যোজনী	মারাঠি	মারাঠি	মারাঠি	নাগা

বিশদ বিবরণীর জন্য যোগাযোগ করুন

বরদা টাইপ ফাউণ্ড্রী

48 pt. Baroda 48 pt. Baroda 48 pt. Baroda

২২।৫এ, শ্যামাপুকুর লেন, কলিকাতা—৯

হৃদয়পুরের রাজা

সলিল মিত্র

হৃদয়পুরের রাজার মনে বড়ো অশান্তি। সারাটা রাজ্য জুড়ে খরার ভীষণ দাপট চলেছে। নদী নালা শুকিয়ে গেছে, গভীর কূপও জলশূন্য! যে রূপ সরোবর অরূপ সরোবরে, কাকচক্ষুর মতো জল টলটল করত, যে জলের বুকে শত সহস্র শ্বেত পদ্ম, রাঙা পদ্ম পাপড়ি মেলে খুশিতে দোল খেত–সে সরোবর দুটিও সূর্যের রোষে শুকিয়ে গেছে! হৃদয়পুরের রাজার মনে তাই বড়ো অশান্তি!

রোজই গ্রামের প্রজারা ছুটে আসছে রাজধানীতে রাজার কাছে, হাত জোড় করে দাঁড়াচ্ছে রাজার সামনে, কাতর কণ্ঠে বলছে: মহারাজ, আমাদের সব জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে গেল। রক্ষা করুন! তাজা সবুজ ফসল শুকিয়ে কুঁকড়ে মরে যাচ্ছে, এবার মানুষও খিদেয় পুড়ে মরবে। আপনি দেশের রক্ষাকর্তা, এর একটা বিহিত করুন মহারাজ! রক্ষা করুন আপনার সন্তানতুল্য প্রজাকে!

সন্তানতুল্য প্রজা,–কথাটা ভাবতে ভাবতে রাজার আহার গেল, নিদ্রা গেল, মনে শান্তিও রইল না! সত্যিই তো প্রজা হচ্ছে রাজার সন্তান! সেই সন্তান প্রচন্ড খরায় তৃষ্ণার জল প্রার্থনা করছে, রাজা কি এই অবস্থায় নীরব থাকতে পারেন?

রাজার কষ্ট দেখে রাণীরও কষ্টের শেষ রইল না। তিনি বললেন, তুমি এক কাজ কর, মন্ত্রীকে ডাকো, তাঁর সংগে পরামর্শ কর। তিনি বড়ো প্রবীণ আর অভিজ্ঞ মানুষ। মানুষের মংগলের কথা তিনিও তো ভাবছেন!

তাই হলো। রাণীর পরামর্শ মতো মন্ত্রীকে ডাকলেন রাজা রাজপুরীতে। মন্ত্রী এসে বললেন: মহারাজের কী আদেশ?

বিমর্ষ রাজা বললেন: প্রচন্ড অনাবৃষ্টিতে প্রজাদের দুরবস্হার কথা নিশ্চয়ই আপনি চিন্তা করছেন! আমি তো আর তাদের হাহাকারে কান পাততে পারছি না!

মৃদু হেসে মন্ত্রী বললেন: আমি বুঝি কান পাততে পারছি মহারাজ? আমার হৃদয়টা কি কঠিন ধাতুতে গড়া?

ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে করতে রাজা বললেন; কঠিন ধাতুতে গড়া নয় বলেই তো আপনাকে আমি ডেকেছি মন্ত্রী! হতভাগ্য প্রজাদের বাঁচাবার জন্য, তাদের

সবুজ ফসলকে রক্ষা করার জন্যে কী সিদ্ধান্ত নেওয়া যায় আপনি স্হির করুন!

একদিন সকালে রাজদরবারে বৈঠক বসল। রাজা, মন্ত্রী এবং তাদের সংগে রইলেন বিশিষ্ট কয়েকজন রাজকর্মচারী।

মন্ত্রী বললেন: জলের এমন ব্যবস্হা করতে হবে মহারাজ, আর যেন না কখনো প্রজাদের এই দুর্দশা হয়!

রাজকর্মচারীরা বললেন:

–যেন জলের অভাবে একটি প্রজাও বেঘোরে প্রাণ না হারায়!

–যেন সবুজ শস্য মাটির রস না পেয়ে শুকিয়ে না যায়!

–যেন তৃষ্ণার যন্ত্রণায় মানুষ পাগল হয়ে না যায়!

মন্ত্রী বললেন: একটি জলাশয় খনন করা হোক, যে–জলাশয় কোনোদিন কখনো মানুষের তৃষ্ণা নিবারণে কৃপণতা করবে না!

–তাই হোক,

–তাই হোক,

–তাই-ই হোক!

সকলের এক মত!

জলাশয় খনন শুরু হলো। হাজার হাজার মজুর মাটি খুঁড়ে নির্মাণ করল দীর্ঘ জলাশয়–যা হ্রদের রূপ নিল!

রাজপুরীতে পালংকে শুয়ে এইবার রাজা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। রাণী বললেন: রাজা এবার দুচোখের পাতা এক কর! জলাশয় জলে ভরে উঠবে, প্রজাদের তৃষ্ণা দূর হবে, সোনার ফসল বাতাসে দোল খাবে! আর চিন্তা করো না!

রাজাও তাই ভাবলেন, আর চিন্তা করে কাজ কি! প্রজারা তো এবার জল পাবেই, তাদের হাহাকারও থামবে!

কিন্তু হায়! রাজার স্বপ্ন সফল হলো না। কী গভীর, কতো বিশাল জলাশয়–তাতেও কণামাত্র জলের সন্ধান মিললো না!

রাজা মন্ত্রীর সংগে পরামর্শ করে আদেশ দিলেন: আরো গভীর করা হোক জলাশয়!

তাই হলো, শ্রমিকরা আরো মাটি তুললো, আরো গভীর হলো জলাশয়, কিন্তু জল উঠলো না পাতালপুরী থেকে!

হতাশা আর দুঃখে রাজা ভেঙে পড়তে লাগলেন! এতো চেষ্টা করেও কিছু করা গেল না! তবে দেশ বাঁচবে কেমন করে!

দেখতে দেখতে বছর ঘুরলো, বর্ষার আভাস নিয়ে দু'চার টুকরো মেঘ আকাশে ভেসে এলো! রাজা ভাবলেন, এবার শান্ত হবে মানুষের হাহাকার, শস্যের সম্ভারে দেশ ভরে যাবে! বর্ষা আসছে, বর্ষা আসছে, বর্ষা আসছে।

কিন্তু বর্ষা ঋতু এলো, বর্ষা এলো না! এক পশলা বৃষ্টিও মাটিকে সরস করতে ঝরে পড়লো না আকাশ থেকে!

রাজার মুখে পড়লো কালো ছায়া, মন্ত্রীর মুখেও সেই ছায়া। অসহায় প্রজার আর্তনাদে আবার ভরে উঠলো রাজপুরী!

তিনদিনের মধ্যে তুমি তোমার সন্তানকে এখানে রেখে যাবে।

বিমর্ষ রাজা অন্ধকারে একা একা বেরিয়ে পড়েন পথে, চলে আসেন জলাশয়ের কাছে, যে জলাশয় জলশূন্য অবস্থায় মানুষকে ব্যংগ করছে।

একদিন রাজা এক কান্ড করে ফেললেন। অন্ধকার রাত্রে জলাশয়ের গভীরে নেমে এলেন তিনি, এসে শুকনো নীরস মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন, মিনতি করে বললেন: ধরিত্রী, তুমি জীবন দাও! মানুষের তৃষ্ণাকে নিবারণ করে তুমি রাজ্যকে শান্তিময় কর, শস্যের ভান্ডার পূর্ণ হোক

জলরাশির উপর দিয়ে সেই সন্ন্যাসী যেন হেঁটে চলেছেন।

তোমার করুণায়! ধরিত্রী, তুমি জল দাও!–মাটির বুকে লুটিয়ে পড়ে রাজা প্রার্থনা জানাতে লাগলেন ধরিত্রী মাতার কাছে।

কতক্ষণ এই ভাবে কেটেছে কে জানে–হঠাৎ রাজার পিছন থেকে কে যেন বলে উঠলেন: রাজা, তুমি উঠে দাঁড়াও।

চমকে উঠলেন রাজা, পিছন ফিরে তাকালেন। অন্ধকার হলেও তিনি দেখতে পেলেন, এক জটাজুট সন্ন্যাসী। তাঁর মুখে অপূর্ব এক আলোর দ্যুতি! চোখ দুটি অতি শান্ত!

রাজা উঠে দাঁড়িয়ে হাত জোড় করলেন।

সন্ন্যাসী বললেন: প্রজাদের কি তুমি সন্তানতুল্য ভালবাসো?

রাজা ধীরে মাথা নাড়লেন।

–তাদের জন্যে তুমি সব ত্যাগ করতে পারো?

–পারি। –সবিনয়ে উত্তর দিলেন রাজা।

–সহস্র সন্তানের কল্যাণে তুমি আপন সন্তানকে বিসর্জন দিতে পারবে?

রাজার বুক থরথর করে কেঁপে উঠল! মুহূর্তের জন্যে দু চোখে অন্ধকার জমে উঠল।

সন্ন্যাসী অতি সহজ ভাবেই বললেন, উত্তর দাও। পারবে কি? তোমার জ্যেষ্ঠ সন্তানকে বিসর্জন দিতে?

রাজা ক্ষণকাল নিথর অন্ধকারে বুঝি একটু আলো খোঁজার চেষ্টা করলেন, তারপর অতি শান্ত কণ্ঠে জবাব দিলেন, পারবো, এক সন্তানের বিনিময়ে যদি আমি সহস্র সন্তানকে জীবিত রাখতে পারি তো সে হবে আমার পরম সৌভাগ্য!

সন্ন্যাসী বললেন, তিনদিনের মধ্যে তুমি তোমার সন্তানকে এখানে রেখে যাবে, বিনিময়ে পূর্ণ হবে তোমার জলাশয়, কোনোদিন তার জল শুকিয়ে যাবে না।

রাজা সন্ন্যাসীকে প্রণাম করে তাকিয়ে দেখলেন, কোথায় সন্ন্যাসী? কেউ তো নেই সেখানে!

রাজপুরীতে ফিরে এসে রাজা ভাবলেন, কে ঐ সন্ন্যাসী?কোথা থেকেই বা এলেন আর কোথায় বা গেলেন? এই নিষ্ঠুর আদেশই বা করে গেলেন কেন?কিন্তু এই আদেশকে নিষ্ঠুরই বা বলা যায় কেমন করে? প্রজারা রাজার সন্তান, তাদের রক্ষার্থে নিজের সন্তানকে বিসর্জন দেওয়া এমন কি কঠিন কাজ হবে? কিন্তু রাণী? সন্তানের বিসর্জন তিনি কি সহ্য করতে পারবেন? রাজা তাই কয়েকদিনের জন্যে রাণীকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর পিত্রালয়ে।

কিন্তু ঘুমন্ত শিশুর মুখের দিকে তাকিয়ে রাজার বুক কেঁপে উঠছে কেন? রাজা ঊর্ধ্বে মুখ তুলে বললেন–ঈশ্বর, এ কী পরীক্ষা তুমি করছ? তাই পরীক্ষাই যদি করছ তো আমায় সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার শক্তি দাও।

এবার রাজা ঘুমন্ত সন্তানকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে বেরিয়ে এলেন রাজপুরী থেকে। মধ্য রাত্রের অন্ধকার। কেউ জেগে নেই, শুধু সামনের ফটকে এক প্রহরী প্রহরারত। সে জানতেই পারলো না যে এই মুহূর্তে মহারাজ আপন সন্তানকে বুকে নিয়ে রাজপুরী থেকে বেরিয়ে গেলেন।

রাজা বেশ খানিকটা পথ অতিক্রম করে জলাশয়ের তীরে এসে দাঁড়ালেন। শূন্য জলাশয়, কিন্তু ধরিত্রী মাতা

নাকি এই সন্তানকে কাছে নিয়ে অনন্ত জলরাশিতে পূর্ণ করবেন এই শূন্যতা! রাজা নেমে এলেন জলাশয়ের গর্ভে, সন্তানকে শুইয়ে দিলেন মাটিতে, তারপর দ্রুত পায়ে ফিরে এলেন উপরে!

আর কি আশ্চর্য, রাজা উপরে উঠে আসার সংগে সংগেই জলাশয়ের শূন্য গর্ভ জলরাশিতে পূর্ণ হয়ে গেল। রাজার মনে হলো, জলরাশির উপর দিয়ে সেই সন্ন্যাসী যেন হেঁটে চলেছেন, বুকের কাছে ঘুমন্ত সত্যব্রত।

–সত্যব্রত, তুই বেঁচে থাক বাবা, মানুষের কল্যাণেই তুই মানুষের বুকের মধ্যে বেঁচে থাক্–মনে মনে এই কথা বলতে বলতে রাজা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে শুনতে লাগলেন জলকল্লোল, আর তাঁর অজান্তেই দু'ফোঁটা চোখের জল মিশে গেল টলটলে জলের বুকে!

সকাল হতে না হতেই মন্ত্রী ছুটে এলেন রাজপুরীতে, ছুটে এলেন সভাসদরা, এলেন রাজকর্মচারীরা। সকলের চোখেমুখে খুশি উপছে উঠছে, সকলেই খবর এনেছেন জলাশয়ের।

রাজার রাত্রে ঘুম হয়নি, শরীর ক্লান্ত, মন বিষণ্ণ–তবু তিনি সকলের সংগে দেখা করে তাঁদের অভিবাদন জানিয়ে বললেন: আপনাদের সকলের চেষ্টাতেই এই অসম্ভব সম্ভব হলো, দেশের কল্যাণ হলো!

অনেক দিনের আকাল কেটে গেল, শুষ্ক ধরিত্রী এবার সরস হলো, সবুজ ফসলে এবার দেশ ভরে উঠবে–রাজা ভাবেন এ কথা, আর ভাবতে ভাবতে তাঁর বুক আনন্দে ভরে ওঠে!

কিন্ত এত আনন্দের মধ্যেও তাঁর বুকে যেন একটা শোকের কাঁটা খচখচ করে ওঠে, সত্যব্রত নেই, তাকে তিনি উৎসর্গ করেছেন প্রজাদের স্বার্থে, এক সন্তান চলে গেল সহস্র সন্তানের কল্যাণে! কিন্তু বুকের পাঁজর খুলে দিয়েছেন রাজা, সে-কথা কি তিনি ভুলতে পারেন?

রাণী পিত্রালয়ে, তিনিও রাজ্যের শুভ সংবাদ পেয়ে গেলেন। জলাশয়ের জল দেখবার জন্যে তাঁর মন চঞ্চল হয়ে উঠল। তা ছাড়া সত্যব্রতকে তিনি রাজপুরীতে রেখে এসেছেন তার জন্যেও মন কাতর!

রাণী একদিন একজন পরিচারিকাকে সংগে নিয়ে বেরিয়ে পড়লেন রাজপুরীর উদ্দেশে। পথের মাঝে পড়ল জলাশয়! জলাশয়ের সামনে এসে তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। কতো জল! প্রাণ জুড়িয়ে গেল রাণীর!

রাণী জলাশয়ের বাঁধে বসে পড়লেন। জোড় হাতে জলের দেবতাকে প্রণাম করে বললেন: হে দেবতা, তুমি প্রসন্ন থেকো, তোমার করুণায় তুমি সার্থক কোরো মানুষের জীবন, শস্যের সম্ভারে আর সবুজ বনানীতে তুমি সাজিয়ে রেখো পৃথিবীকে!

দেবতাকে স্মরণ করে মাথা নত করে প্রণাম করছেন রাণী। এমন সময় দুখানা কচি হাতে কে তাঁকে জড়িয়ে ধরল।

রাণী মুখ ফিরিয়ে দেখেই অবাক! এ কি! এতো দূরে তাঁর সত্যব্রত এলো কি করে?

রাণী ছেলেকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে বললেন: হ্যাঁরে বাবা, তুই এখানে কি করে এলি? এতো দূরে, একা একা?

সত্য বললে–আমি তো ঐ জলের নিচে থেকে উঠে এলুম মা! এক সন্ন্যাসী ঠাকুর আমাকে বুকে করে এখানে দিয়ে গেলেন!

রাণী কিছুই বুঝতে পারছিলেন না! তিনি ছেলেকে কোলে নিয়ে রাজপুরীতে ফিরে এলেন।

রাজা তো ছেলেকে দেখে ছুটে এসে বুকে তুলে নিলেন, বললেন, রাণী সত্যকে তুমি কেমন করে পেলে? কোথায় পেলে?

রাণী সবকথা বললেন। রাজা বুঝলেন, সেই সন্ন্যাসীর দয়াতেই তাঁর সত্যব্রত আবার ফিরে এসেছে! সন্ন্যাসীকে স্মরণ করে তিনি আবার দু'হাত এক করে কপালে ঠেকালেন। তাঁর শূন্য বুক এবার পূর্ণ হয়ে গেল।

রাত্রে ছেলেকে সংগে নিয়ে রাজা শুয়ে আছেন। তন্দ্রার ঘোর তাঁর দু চোখে। হঠাৎ অন্ধকার ঘর এক অপরূপ জ্যোতিতে পূর্ণ হয়ে উঠলো। রাজা দেখলেন, সেই জটাজুট সন্ন্যাসী, তিনি বলছেন,–রাজা, তুমি সত্যিই মহান! দেশের জনগণের কল্যাণে আপন সন্তানকেও ত্যাগ করতে দ্বিধা করোনি। প্রজাপালনে তুমি যে মহত্ত্ব দেখিয়েছ তার তুলনা নেই! আমি বৃষ্টির দেবতা, তোমায় পরীক্ষা করছিলাম মাত্র! জীবনে সর্বস্ব ত্যাগের ব্রতে উত্তীর্ণ হয়ে তুমি সন্তানকে ফিরে পেলে! রাজা যখন প্রজার কল্যাণে সবকিছু ত্যাগ করতে পারেন তখনই তিনি প্রকৃত রাজা! প্রকৃত প্রজাহিতৈষী রাজার রাজ্যে কখনো জলাভাব হবে না, দুর্ভিক্ষ হবে না–এই আমি তোমাকে বলে গেলাম!

শয্যা ছেড়ে উঠে বসলেন রাজা, কিন্তু ঘরের মধ্যে কেউ নেই, আবার সেই অন্ধকার, কিন্তু সেই অন্ধকারের ভেতর থেকেই রাজা তাঁর জীবনের আসল সত্যকে খুঁজে পেলেন!

ছবি: ইন্দ্রনীল ঘোষ

মুন্ডু পাহাড়ের ভয়ংকর

সুভাষ চৌধুরী

হঠাৎ-ই আলাপ হয়ে গেল বিহার ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের চিফ্ কনজারভেটর মিস্টার শাহীর সংগে। সকলের মুখে শুনেছিলাম, ভদ্রলোক ভয়ংকর রাশভারী। কম কথা বলেন। বিশেষ জরুরী কারণ না থাকলে কারো সংগে দেখাই করেন না।–হবেও-বা। কিন্তু ওকে আমার দরকার। তাই একদিন সোজা গিয়ে হাজির হলাম ওঁর অফিসে। কাউকে কোনো কথা বলার সুযোগ না দিয়ে মুখোমুখি তাঁর সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। পরিচয় দিলাম নিজের। সেই রাশভারী গম্ভীর লোকটি একগাল হেসে বললেন, ভেরী গ্লাড টু মিট্ ইউ–আপনার জন্য কী করতে পারি।

বিনীত ভাবে বললাম, যদি একটা ফরেস্ট রিজার্ভেশন দেন–খুব খুশি হব।

মিস্টার শাহী মৃদু হেসে বললেন, ফরেস্ট রিজার্ভেশন চাইছেন মনের বাসনাটা কী আপনার?

আমিও হেসে বললাম, বড় শখ আমার রয়েল মারার। আপনি একটু অনুগ্রহ করলেই আমার শখটা মেটে।

–সো কনফিডেন্ট–কেমন একটা অবিশ্বাসের সুরে কথাটা বললেন মিস্টার শাহী।

একটু ভয় পেলাম, তাড়াতাড়ি বললাম, পারমিশনটা দেবেন তো? আমার মামা পি. কে. সরকার পাটনার ট্রাইবুনাল সেসন জজ। তাঁর কাছে আপনার কথা শুনেছি।

ওষুধটা ধরলো।

খুব আনন্দিত স্বরে শাহী বললেন, ইজ ইট? আগে বলেন নি কেন? হি হিজ এ গুড্ ফ্রেন্ড অব্ মাইন। তারপর বললেন, ডু ওয়ান থিং–আমি মুন্ডু ফরেস্টে আপনাকে দশ দিনের রিজার্ভেশন দিচ্ছি। এবার খুশি তো?

দেঁতো হাসি হেসে একটু কিন্তু কিন্তু করে বললাম, মাত্র দশ দিন? আমি একমাসের প্রোগ্রাম নিয়ে বেরিয়েছি। আর দশটা দিন যদি–

কথাটা শেষ করতে দিলেন না মিস্টার শাহী, একটা অফিসিয়াল প্যাড টেনে খসখস করে কিছু লিখতে লিখতে বললেন, এ্যানাদার টেন ডেজ ফর কুটকু। আমি দু'জায়গায় ডি.এফ.ও.কে চিঠি দিয়ে দিচ্ছি–বাট্ ওয়ান থিং–আমার জিজ্ঞাসু দৃষ্টির সংগে দৃষ্টি মিলিয়ে মিস্টার শাহী বললেন, জানোয়ার মারবার একটা লিমিটেশন

আছে। আপনার এক্তিয়ারে কতটা কি থাকবে তারও একটা লিস্ট ডি.এফ.ও. পারমিশনের সংগেই পাবেন।

মুণ্ডু ফরেস্টের ডি.এফ.ও.কে লেখা চিঠিটা দেখলাম। এক জায়গায় মিস্টার শাহী লিখেছেন–হি ইজ ভেরী ফণ্ড অব রয়েল। এ্যারেঞ্জ একরডিংলি। অতঃপর শাহী সাহেবকে সেলাম ঠুকে নাচতে নাচতে বেরিয়ে এলাম।

মুণ্ডু যাত্রার তোড়জোড় শুরু হয়ে গেল। ইতিমধ্যে রবি আয়কৎ ও কেষ্ট ঘোষের সংগে আমার বন্ধুত্ব আরো পাকা হয়েছে। তারা তো খবরটা পেয়ে খুব খুশি। এবারের অভিযানে রাঁচীর আরও একজন আমাদের সংগী হলো। নাম তার পাঁচু বোস। সাইজে চার ফুট বাই চার ফুট। কুচকুচে কালো রঙ। তার উপর রূপের বাহার খুলেছে তার সব সময় পান খাওয়ার জন্য টুক্‌টুকে লাল ঠোঁট দুটির দৌলতে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার, এত পান খাওয়া সত্ত্বেও তাঁর দাঁতগুলো আশ্চর্য রকম চকচকে এবং সাদা। এবং অন্ধকারে পাঁচুর অস্তিত্ব বোঝা যায় তার হাসিতে; অর্থাৎ সাদা দাঁতগুলো দেখে।

রবি, কেষ্টবাবু ছাড়া এবারে এই পাঁচু বোসও আমার সংগী হলো।

যাত্রার দিন ঠিক হলো পুজোর পরে কালীপুজোর আগে। বর্ষার শুরুতে মরা কোয়েল ভরে ওঠে। যখন আমরা যাত্রা শুরু করলাম সময়টা বর্ষার কিছু পরে হলেও–তখনও কোয়েল টইটম্বুর।

আমি তখন একটা জিপ কিনেছি। সেটাকে সাজিয়ে গুছিয়ে নিজের মনের মতন করে নিয়েছি। কলকাতা থেকে সেই জিপেই রাঁচী পৌঁছালাম, সংগে চাকর হরিপদ আর বাবুর্চী হামিদ। ওদেরও সংগে নিলাম। কি জানি কখন কি প্রয়োজন হয়। ইস্টবেংগল ক্লাবের বিখ্যাত ফুটবলার সুনীল ঘোষের ভাই বাচ্চু ঘোষও বড় উৎসাহে আমার সংগী হলো। রাঁচী পৌঁছে সেখান থেকে কেষ্টবাবু, রবি আর পাঁচুকে তুলে নিলাম জিপে। তারপর একানব্বই নম্বর মাইল পোস্ট থেকে বাঁ দিকে ঘুরে সোজা মুণ্ডু ফরেস্ট। বর্তমানে যেটা বেতলা স্যানচুরীতে যাবার রাস্তা। মুণ্ডু ফরেস্টে যখন পৌঁছুলাম তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। রাত প্রায় আটটা। দেখলাম ফরেস্টের গেট বন্ধ। ধারে কাছে কাউকে দেখা গেল না। অনেকক্ষণ ধরে সাতজনের একটানা হাঁকাহাঁকির পর দেখা গেল ফরেস্টের ভেতর একটা উঁচু জায়গা থেকে জ্বলন্ত কাঠ হাতে একটা লোক নেমে আমাদের দিকেই এগিয়ে আসছে।

রাগ করে বললাম, এতক্ষণ ধরে চেঁচামেচি করছি–কানে তুলো গুঁজে ছিলে?

লোকটা রাগলো না। বিনীতভাবে বললো, নেহী সাব, বাঘোয়া বোলা রহা থা। ইসি লিয়ে হাম্ নেহী উতারহা থা।

রোগা পটকা রবি ভীমগর্জনে বললো, হামলোগ তো নেহী শুনা। কাঁহা বোলা রাহা থা?

লোকটা মুখ খোলার আগেই বাঘের রক্ত-জল-করা ডাক শোনা গেল।

তড়িৎগতিতে গেট খুলে ভয়ার্ত কণ্ঠে লোকটা বলে, শুনা? জলদি আইয়ে।

আমরা চট্‌পট্ গাড়ি স্টার্ট করে ফরেস্ট এরিয়ার ভেতরে ঢুকে গেলাম। লোকটা গেট বন্ধ করে ডান দিকের ছোট্ট টিলাটায় তরতর করে জ্বলন্ত কাঠ হাতে উঠে গেল। আমরাও জিপ নিয়ে মিনিট দশেকের মধ্যে ফরেস্ট বাংলোতে পৌঁছে গেলাম।

তারপর গার্ড এলো। বাংলো খুললো। সংগীরা জিপ থেকে লাগেজগুলো নামিয়ে ঘরে তুললো। বন্দুক, রাইফেল একপাশে সাজিয়ে রাখলাম। তারপর টর্চ নিয়ে বাংলোর চতুর্দিকটা দেখে ভাল করে কার্বলিক অ্যাসিড ছড়িয়ে ঘরে ফিরে এলাম। কিন্তু আলোর কি হবে? গার্ড খুঁজে পেতে একটা ভাঙা পেট্রোম্যাক্স নিয়ে এলো। তাতে তেল যদি-বা কিছুটা ছিল কিন্তু ম্যাণ্টেলটা কোথায় উধাও হয়ে গেছে। অন্ধকারে পাঁচুকে দেখা যাচ্ছিল না, এবার তার গলা শুনলাম, মরেছে! ম্যাণ্টেল ছাড়াই পেট্রোম্যাক্স জ্বলবে নাকি?

রবি গম্ভীর হয়ে বললো, প্লিজ স্টপ ডিসটারবিং–তারপর আমার উদ্দেশে বললো, টুলু, ম্যাণ্টেল। প্রসংগত বলে রাখি আমার ডাকনাম টুলু। রবি আমার স্বভাব জানতো। জানতো যে, আমাদের যা যা প্রয়োজন হতে পারে সব কিছুই আমি সংগে নিয়ে বেরিয়েছি। মায় সূচটুকু পর্যন্ত।

আমি ব্যাগ খুলে ম্যাণ্টেল বার করে রবির হাতে দিলাম। ও সেটা পেট্রোম্যাক্সে পরালো, আলো জ্বললো, একগাল হেসে পাঁচু বললো, এই না হলে টুলুবাবু! জয় টুলুবাবুর জয়–

চাল, ডাল, আটা, ময়দা, তরিতরকারী সবই ছিল সংগে। হামিদকে বললাম রাত্রের জন্য সাদামাটা রান্না করতে। বেগুন ভাজা, রুটি আর ডাল।

খবর পেয়ে ফরেস্টার সাহেব এলেন। বয়সে বৃদ্ধ। বড়

ভালো লোক। মনে আছে মুণ্ডু ছেড়ে আমরা যখন চলে এলাম তখন তিনি চোখের জল চাপতে পারেন নি।

ডিসেম্বরের শীত। হি হি করে কাঁপছিলাম। আমাদের অবস্থা দেখে বৃদ্ধ কিছু কাঠ আনিয়ে দিলেন। আর একটা মুরগী। এ যেন মেঘ না চাইতেই জল। আগুন জ্বালানো হলো। মুরগীও রান্না হলো। হামিদের রান্নার তো তুলনা নেই। ভোজনটা একটু গুরুই হয়ে গেল। উপরন্তু ফরেস্টার সাহেবের পরামর্শ মতো খড়ের গদির উপর শতরঞ্জি বিছিয়ে গায়ে মোটা কম্বল চাপিয়ে ঘুমটাও জমলো বেশ।

পরদিন সকালে ঘুম ভাঙলো গার্ডের হাঁকাহাঁকিতে। খুব করিৎকর্মা লোক। উঠে দেখলাম, বাংলোর সামনে অনেক লোক জড়ো হয়ে নিজেদের ভাষায় কথাবার্তা বলছে। ফরেস্টার ভদ্রলোকও এসে গেছেন। তিনিই বললেন, শিকারে যাবেন তো? সব ব্যবস্থা করে রেখেছি।

আমরাও রেডি। বাচ্চু ঘোষ বললো, কাঁচা ঘুমে শিকার দেখতে যাওয়ার আমার মানা আছে। এ যাত্রায় আমি বাদ বলেই আবার চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লো। পরে জানতে পেরেছিলাম, আমরা বেরিয়ে যাবার পরেই হামিদকে ডেকে বাচ্চু বলেছিল, ও সব বাঘ-টাগে আমি নেই। যতসব বাজে ব্যাপার। হরিণ হতো তো যেতাম। তুমি বরঞ্চ আমায় এক কাপ গরম কফি করে দাও। আমি রোদ্দুরে গিয়ে বসছি।

আমরা বেরিয়ে পড়লাম। স্পটে পৌঁছে দেখলাম চারটে মাচা বাঁধা হয়েছে। একটা মাচায় বসলো কেষ্টবাবু আর ফরেস্টার, আর একটায় আমি ও রবি, অন্য দুটোয় বসলো দুজন চেক। এই চেকদের কাজ হলো জংগল থেকে জানোয়ার বেরিয়ে এদিক ওদিক ছিটকে গেলে নানারকম আওয়াজ করে আমাদের সামনে এনে ফেলা।

সকাল আটটায় বিট্। রানার জানান দিল বিট্ চালু হুয়া হ্যায়। আমরা প্রস্তুত হয়ে আছি। মনে দারুণ উত্তেজনা। অথচ এইসময় মাথা অত্যন্ত ঠাণ্ডা রাখতে হয়। মনকে বশে আনবার চেষ্টা করতে লাগলাম। বিটের বিচিত্র সব শব্দ অস্পষ্টভাবে কানে ভেসে আসছিল। কেউ মুখে শব্দ করছে, কেউ ক্যানাস্তারা পেটাচ্ছে, কেউ লাঠি দিয়ে গাছের গায়ে শব্দ করছে। সমবেত বিচিত্র শব্দরাশি ক্রমশই কাছে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ একটা বড় সম্বর ছুটতে ছুটতে এসে একেবারে আমার মাচার সামনের খোলা জায়গাটায় দাঁড়ালো। মুহূর্তে আমার হাতের রাইফেল গর্জে উঠল। সম্বরটা ঘুরে পড়ে গেল এত আয়োজনের পরিসমাপ্তি ঘটল এক লহমায়।

হঠাৎ কানে ভেসে এলো একটা গুড়গুড় আওয়াজ। মনে হলো পাহাড়ের ওপর থেকে কেউ পাথর গড়িয়ে দিচ্ছে। বিটারের চিৎকার কানের পর্দায় আছড়ে পড়লো, হুঁশিয়ার----বড়কা জানোয়ার আওয়াত হ্যায়।

সম্বরটা তখনো ছটফট করছে, আমরাও নড়ে-চড়ে বসলাম। বড়কা জানোয়ার কী হতে পারে? রয়েল নয় তো? উত্তেজনায় টানটান হয়ে সমস্ত ইন্দ্রিয়কে সজাগ রেখে রাইফেলে হাত রেখে অপেক্ষা করতে লাগলাম। হঠাৎ রবি আমার কাঁধে আলতো করে আঙুল ঠেকালো। চেখে তুলে দেখলাম সাক্ষাৎ কৃতান্তের মতো একটা বাইসন আমাদের বাঁ-দিকের পাহাড় থেকে ঝড়ের গতিতে নেমে আসছে। বিটারদের চিৎকার ও শব্দ তখন উচ্চগ্রামে ধ্বনিত হচ্ছে। বাইসনটা আসছে–প্রতি মুহূর্তে তার স্পর্ধিত ক্ষুরের আঘাতে চূর্ণ হচ্ছে পাথরের নুড়ি–গতিবেগে উঠছে ধুলোর ঝড়। আসতে আসতে হঠাৎ সম্বরটার সামনে থমকে দাঁড়ালো–অতবড় শরীরটা নিয়ে অবিশ্বাস্য দ্রুতগতিতে ঘুরলো আমাদের দিকে। ওদের কি অতীন্দ্রিয় ক্ষমতা আছে জানিনা–মুহূর্তে বুঝি বুঝতে পারলো শত্রু কাছেই এবং তেড়ে এলো আমার মাচা লক্ষ্য করে। ট্রিগারের চাপে ৩৭৫ বোরের মৃত্যুবাণ ছুটলো। থমকে দাঁড়ালো বাইসনটা–মাথা নিচু করে পা দিয়ে মাটি আঁচড়াচ্ছে। ডিসেম্বরের শীত, তবুও আমি ঘামছি। রবি চাপা স্বরে বললো, নেকে গুলি কর। তা-ই করলাম। দ্বিতীয় গুলিটা খেয়ে বাইসনটা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপতে লাগলো কিছুক্ষণ; তারপর বসলো; মাচার সামনে শুয়ে পড়লো। ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো আমার।

ডি.এফ.ও.পারমিশন লেটারের সংগে কি কি জানোয়ার মারতে পারি তার একটা লিস্ট আমাকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে ছিল–

১) বোর এন্ড বিয়ার–আনলিমিটেড
২) বাকিং ডিয়ার–টু
৩) স্পটেড ডিয়ার–টু
৪) লেপার্ড–ওয়ান
৫) রয়েল–ওয়ান
৬) সম্বর–টু

লিস্টে বাইসনের কোনো উল্লেখ ছিল না। রবির কাছে শুনলাম পারমিশন ছাড়া কোনো জানোয়ার মারার জরিমানা পঞ্চাশ টাকা। উত্তেজনায় ফরেস্টার সাহেবের

হাতে একশ টাকা দিয়ে বললাম, সবকো খিলা দিজিয়ে।

বাংলোয় ফিরে সম্বরের রোস্ট আর কাবাব তৈরি করলো হামিদ। কেষ্ট বললো, কাল তোমাদের একটা নতুন খাবার খাওয়াবো।

বাচ্চু বললো, কী খাবার কেষ্টদা?

কেষ্ট বললো, বাঁশপোড়া। সে এক আশ্চর্য খাবার। একগাঁট বাঁশ কেটে তাতে ফোকর করে তেলমশলা মাখানো মাংস পুরে ফোকর বন্ধ করে মাটি লেপে উনোনের ভেতর ফেলে দেওয়া হলো। তারপর একটা শব্দ 'ফট'। কেষ্টবাবু বললো, হয়ে গেছে। প্লেটে প্লেটে খাবার এলো, কি স্বাদ, ভোলার নয়।

বাইসনটা মেরে খুব একটা আনন্দ পাচ্ছিলাম না। মনে হচ্ছিল এতে আমার খুব একটা কৃতিত্ব নেই।

ফরেস্টার সাহেব আমাকে আশ্বস্ত করলেন, বললেন, 'আপনি গোটা এলাকার মানুষকে একটা মূর্তিমান আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন। এই বাইসনটা ছিল একটা সলিটারি মেল। দলছুট হয়ে এতদিন ভয়ংকর কাণ্ডকারখানা করে বেড়াচ্ছিল। একবার তো আমার ফরেস্ট গার্ডকে তাড়া করে দুদিন গাছের উপরেই আটকে রেখেছিল। ঐ ব্লকে আমাদের কাজ করা প্রায় বন্ধই করে দিয়েছিলাম। আপনি বাঁচালেন।

এইভাবে দুই তিন দিন কাটলো, আমরাও ট্রাকার ঠিক খবর নিতে লাগলাম যদি বাঘ পাওয়া যায়। সারাদিন জঙ্গলে ঘুরতাম, সন্ধ্যেবেলায় ফিরে আসতাম বাংলোতে। এইভাবে আরও কয়েকদিন কাটলো। এরই মধ্যে একদিন এমন একটা দৃশ্য জঙ্গলে দেখলাম যা আমার মনকে ভীষণ ভাবে নাড়া দিয়েছিল।

আকাশে শীতকালেও অল্প অল্প মেঘ করেছে। একটা ময়ূর বনের মধ্যে পেখম তুলে নাচছে। আর ওকে মাঝখানে রেখে প্রায় দশ বারোটা ময়ূরী ঘুরে ঘুরে কী যেন খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে। এত সুন্দর এত বর্ণনাতীত দৃশ্য যে তা আমার কলমে প্রকাশ করার ভাষা নেই। আমরা সেই দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে উপভোগ করেছিলাম।

একদিন দুপুরবেলা আমরা খাওয়া দাওয়া করে বিশ্রাম করছি এমন সময় একজন চরোয়া (যারা গরু চরায়) দৌড়ে এসে খবর দিল যে সে যখন গরু নিয়ে ফিরছিল তার পালের শেষ গরুটা একটু আড়াল হতে তাকে বাঘে মেরে ফেলেছে। আমরাও তৎক্ষণাৎ রওনা হলাম। স্পটে গিয়ে দেখলাম যে গরুটা মরে পড়ে আছে ছোট দুটো পাহাড়ের

মানুষকে একটা মূর্তিমান আতঙ্কের হাত থেকে বাঁচিয়েছেন।

মাঝখান দিয়ে বয়ে আসা একটা ঝরণার পাশে। গরুটাকে সামনের দিক থেকে মারা হয়েছে। আমার স্বল্প ধারণায় বুঝতে পারলাম যে এটা নিশ্চয়ই কোনো রয়েলের-ই শিকার, কারণ রয়েল সব সময় এভাবেই মারে। কিল্‌টাকে দেখে আরও বোঝা গেল যে বাঘটা কাছেই কোথাও আছে কারণ বালির উপর রক্তের দাগ বেশ তাজা আর আস্তে আস্তে তা বালিতে টেনে নিচ্ছে। এর ভেতর কেষ্ট এসে

হঠাৎই দেখলাম একটা দাঁতাল শুয়োর। সঙ্গে আরও চার পাঁচটা।

বালিতে পায়ের ছাপ দেখে বললো, এটা রয়েল এবং একটা পায়ের ছাপ হাল্কা ও বাঁকা রয়েছে। তার মানে ওর পায়ে কোথাও চোট লেগেছে। যাই হোক আমরা কিল্‌টাকে না সরিয়ে পিছিয়ে এলাম। জায়গা খুঁজতে লাগলাম কোথায় বসা যায়। কিন্তু উপযুক্ত কোনো জায়গা না পেয়ে জিপটাকেই খাদে নামিয়ে আনলাম। কিছু ডালপালা কেটে এনে কৃত্রিম ঝোপের সৃষ্টি করা হলো। তারপর কিল্‌টাকে সামনে রেখে জিপেই বসলাম। সেখান থেকে আমরা অন্তত মরা গরুটাকে নজর করতে পারি। আশা করছি যে ও হয়তো আবার আসবে। কিছুক্ষণ বসে থাকার পর পাঁচু হঠাৎ কাশতে আরম্ভ করলে আমি খুব অস্বস্তি বোধ করলাম। পাঁচুকে বললাম, এ রকম শব্দ করলে কোনো জানোয়ার আসবে না। তুই বরঞ্চ বড় রাস্তায় গিয়ে দাঁড়া।

আমরা নিঃশব্দে অপেক্ষা করছি। হঠাৎ একটা মচ্‌মচ্‌ শব্দ পেছন দিক থেকে জিপের দিকে এগিয়ে এলো। পাঁচু কি ফিরে এলো? শব্দটা জিপের কাছাকাছি এসে থেমে গেল। পাঁচু ওখানে দাঁড়িয়ে রইল কেন? সন্তর্পণে সিট ছেড়ে পেছন দিকে এগিয়ে গেলাম। জিপের পেছনের পদটা ফাঁক করলাম। কই কেউ তো নেই। বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল। বুঝলাম রয়েল-টা এসেছিল কিল্‌কে লক্ষ্য করে। আমাদের জিপ দেখে সন্দিগ্ধ হয়ে ফিরে গেছে চুপিসাড়ে। বাধ্য হয়ে সেদিন ফিরে এলাম। স্থানীয় লোকদের বললাম, কিল্‌টা এখানেই থাক, দেখা যাক কাল কিছু করতে পারি কিনা।

পরের দিন যথাসময় স্পটে গিয়ে দেখি বাঘটা কিল্‌টাকে খানিকটা উপরে টেনে নিয়ে গেছে এবং প্রায় অর্ধেকটাই খেয়ে ফেলেছে। আমরা কিল্‌টাকে সামনে রেখে পাহাড়ের একটা ইংরাজি এল অক্ষরের মতো জায়গায় দুজন মিলে তিন ভাগে বসলাম। এল-এর

মাঝখানে বসলাম আমি আর রবি। একদিকে ফরেস্টার আর পাঁচু। অন্যদিকে বাচ্চু ঘোষ আর কেষ্টবাবু। বিটের ব্যবস্থা হয়েছিল। যথাসময়ে বিট শুরু হলো। আমরা সকলে উদগ্রীব হয়ে রইলাম। কী হয়, কী হয়, দারুণ উত্তেজনা। বিটারদের হৈ হৈ শব্দ ক্রমশঃই কাছে এগিয়ে আসছে। হঠাৎ মনে হলো সামনের ঐ টাইগার গ্রাসগুলো নড়ছে। কী ব্যাপার ? রয়েল নয় তো ? ঘাসগুলো নড়ছে। জোরে জোরে। হঠাৎ দেখলাম একটা দাঁতাল শুয়োর। সঙ্গে আরও চার-পাঁচটা। রাইফেল তাক করাই ছিল তবুও ফায়ার করলাম না। কারণ শিকারীদের একটা অলিখিত নিয়ম আছে যে, বাঘ শিকারের সময় প্রথম শিকার হিসেবে বাঘ ছাড়া অন্য কোনো জানোয়ারকে গুলি করা নিয়মবিরুদ্ধ। শুয়োরগুলো রাজকীয় মহিমায় নিজের খেয়ালে সুটিং রেঞ্জের ভেতর এসেও চলে গেল। বিটার্সরা সার্কেল ক্লোজ করতে করতে একসময় সামনে এসে দাঁড়ালো। আমাদের রাইফেলের কোনো আওয়াজ না শুনতে পেয়ে ওরা বললো, বাঘোয়া মিলত নেহী ?

বোঝা গেল আজকের মতো বাঘ শিকারের আশায় বালি। অগত্যা ফেরার পথ ধরলাম। এগিয়ে এসেছি খানিকটা। হঠাৎ কানে এলো ভয়ার্ত চিৎকার, টুলু-দা।

কে ? কে ডাকে ? হঠাৎ খেয়াল হলো দলে বাচ্চু নেই।

আর্ত চিৎকার আবার ভেসে এলো টু-লু-দা। আরে ! এ তো বাচ্চুর গলা। যেখানটায় বাচ্চু বসেছিল তার পাশেই একটা গাছ। দেখলাম গাছের মগডালে বাচ্চু, আমাকে নামাও।

–তুই ওখানে উঠলি কি করে ?

ওকে কোনো রকম ভাবে নিচে নামানো হলো। বলতে গেলে বেঁধেই নামান হলো। বাচ্চুর ভয়ার্ত কণ্ঠের কথা অর্ধেক বোঝা যায়, অর্ধেক বোঝা যায় না এমন ভাবে যা বললো তার অর্থ উদ্ধার করে বুঝলাম এই যে–আমরা যখন বাঘের আশায় সামনের দিকে তাকিয়ে আছি বাঘ তখন আমার পেছনে উঁচু পাহাড়ের উপর বিশ্রাম করছিল। আমাদের সাড়া পেয়ে তাকিয়েছিল একবার আমার দিকে। এটাই বাচ্চুর চোখে পড়েছিল। নিজের অজান্তে প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে উঠে গিয়েছিল গাছের মগডালে। আর বাঘটা একবার আলস্য ভেঙে ঘৃণাভরা দৃষ্টিতে বারেকের জন্য আমাদের দিকে তাকিয়ে একলাফে অন্তর্হিত হয়েছিল পাহাড়ের আড়ালে।

সে বারের মতো বাঘ আর মারা হলো না। আমরা 'কুটকু'র পথে রওনা হয়ে গেলাম।

ছবি : সরোজ সরকার

অনুবাদ সিরিজ

প্রত্যেক মাসে একটি করে নতুন বই বেরুচ্ছে। বিশ্ব সাহিত্যের মণিমুক্তার সংগ্রহশালায় আমাদের নতুন সংযোজন।

১ আগস্ট বেরিয়েছে
স্যার ওয়ালটার স্কটের
দ্য ট্যালিসম্যান

১ জুলাই বেরিয়েছে
মার্ক টোয়েনের
এ্যাডভেঞ্চার্স অফ হাকলেবেরি ফিন

১ জুন বেরিয়েছে
লুইস ক্যারলের
এ্যালিস'স এ্যাডভেঞ্চার্স ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড

১ মে বেরিয়েছে
জ্যাক লণ্ডনের
হোয়াইট ফ্যাং

প্রত্যেকটি বই ছবিতে ভরা। ঝকঝকে প্রচ্ছদ। সুন্দর ছাপা। দাম মাত্র আট টাকা করে।

অনুবাদ সিরিজের আরও কয়েকটি বই

স্টিভেনসনের–কিডন্যাপড, ডাঃ জেকিল অ্যাণ্ড মিঃ হাইড, ট্রেজার আইল্যাণ্ড। ডিকেন্সের–গ্রেট এক্সপেক্টেশনস, অলিভার টুইস্ট, ডেভিড কপারফিল্ড। ওয়েলসের–দ্য ফার্স্ট মেন ইন দ্য মুন, দি ইনভিজিবল ম্যান। কোনান ডয়েলের–দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড। বিচার স্টোর –আংকল টমস কেবিন।

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিঃ
২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৯

জল-জঙ্গলের দেশে

শচীন দাশ

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

ভাবছিল, ভাবতে ভাবতে আবার মনে সাহসও এনেছিল। যাক্ গে এত লোক আছে, সঙ্গে আবার বন্দুকও আছে–ভয় কী! কিন্তু রেঞ্জার সাহেব নুরেশ বলে লোকটাকে ডেকে বন্দুকে কী ভরতে বলল? কী কেটাসেট না কী যেন নাম! ওটাই কি বন্দুকের টোটা নাকি–?

জিজ্ঞেস করবে ভাবছিল, কিন্তু তার আগেই তড়িৎ মামা হঠাৎ ফিসফিস করে কুট্টিমামাকে জিজ্ঞেস করল, নন্দু ওটা বোধহয় ঘুমপাড়ানি ওষুধ, তাই না রে–

–হ্যাঁ–কুট্টিমামা জানাল, কেটাসেট ওষুধ দিয়েই বাঘকে কিছুক্ষণের জন্য ঘুম পাড়িয়ে রাখা যায়। এক একটা ডোজে ১০ সি সি করে থাকে। এই ওষুধের প্রস্তুতকারক আমেরিকার এক কোম্পানী।

পিংকির বিস্ময় ক্রমেই বাড়ছিল। সে এখন জিজ্ঞেস না করে পারল না, কিন্তু কুট্টিমামা, বাঘকে ঘুমপাড়ানি ওষুধ দেওয়া হবে কেন?

কুট্টিমামা হাসল, বা রে জঙ্গলে যদি আমাদের আক্রমণ করে তখন বন্দুক দিয়ে গুলী করে ওর দেহে এই ওষুধ ঢুকিয়ে দেওয়া হবে। ব্যস, বাঘও তখন সঙ্গে সঙ্গে ঘুমে ঢুলে পড়বে। জ্ঞান ফিরলে আবার জঙ্গলে ঘুরে বেড়াবে। এতে বাঘকেও মারতে হল না, বাঘও কাউকে মারতে পারল না।

–কেন! মারলে কি হত?

–না-না–এটা তুমি কী বলছো পিংকিবাবু–রেঞ্জার সাহেব পিংকির কথা শুনতে শুনতে জানালেন, বন্য জন্তু হল দেশের সম্পদ বুঝলে; তাকে কখনো মেরে ফেলতে হয়! বরং আমরা চেষ্টা করছি যাতে সুন্দরবনে বাঘের সংখ্যা বাড়ানো যায়। সেজন্য কোনো বাঘ অসুস্থ হয়েছে জানতে পারলে ধরে এনে তার চিকিৎসাও করা হয়, বুঝলে তো–

–তাই নাকি! বাঃ দারুণ তো–

–শুধু এই নাকি! আরও যে কত আছে–

বলতে বলতে রেঞ্জার সাহেবের কথার মাঝখানেই ইঞ্জিনের শব্দ বন্ধ হয়ে গেল। নিচের দিকে তাকিয়ে পিংকি দেখল, খালাসীরা এখন লঞ্চ ভেড়াচ্ছে।

দেখতে দেখতে লঞ্চটা দাঁড়িয়ে নোঙর ফেলে। আর লঞ্চ থেকে লম্বা লম্বা দুটো মোটা কাঠের তক্তা এনে বিছিয়ে দেওয়া হয় জলের ওপর দিয়ে। এখন দিব্যি সেই তক্তার ওপর দিয়ে হেঁটে ওপারে নামা যায়।

সবাই নামবে, এমন সময় কুট্টিমামাই হঠাৎ বাধা দিল; রেঞ্জার সাহেবের দিকে তাকিয়ে বলল, মিঃ গাঙ্গুলী আমি না হয় পিংকিকে নিয়ে লঞ্চে থাকি।

–কেন! সে কী মশাই–রেঞ্জার সাহেব হা হা করে হেসে উঠলেন, আপনাদের জন্যই আমার আসা। অথচ আপনারাই–

রেঞ্জার সাহেবের কথাটা শেষ হওয়ার আগেই কুট্টিমামা বলে উঠল, না–না সেজন্য নয়। আসলে–বলে পিংকির দিকে চোখ তুলে দেখিয়ে বলল, জঙ্গলে নামবো অথচ সঙ্গে ও, যদি কিছু হয়ে যায়, সেজন্য বলছিলাম।

আপনি ওদের নিয়ে যান না–আমার এই বন্ধু দু'জন দেবাঞ্জন ও তড়িৎ জীবনে কখনো এদিকে আসেনি; ওদের ভালোই লাগবে। আমি তো দেখেছি অনেকবার–

–না-না মশাই, অমন কাণ্ডটি ভুলেও করবেন না। আপনি ভাবছেন, এই নির্জন জায়গায় ভাগনেকে নিয়ে দিব্যি থাকবেন। কিন্তু তাতেই বিপদ বেশি। আমাদের প্রভুটি আবার এই সুযোগই খোঁজেন। কাজেই আমাদের সংগে গেলে ভাগনের আপনার কিছু হবে না। এবং সেটাই নিরাপদ–

পিংকি ততক্ষণে হতভম্ব। কুট্টিমামার কথায় হঠাৎ যেন বোবা হয়ে গিয়েছিল। এত কাছে এসেও বলে কি না তারা লঞ্চে থাকবে! উফ্–ভাগ্যিস রেঞ্জার সাহেব ছিল। তা না হলে বোধহয় এ যাত্রায় আর জংগলে গিয়ে বাঘ দেখা হত না তার।

যাই হোক, রেঞ্জার সাহেবের ভরসায় এরপর পিংকিকে নিয়ে নিচে নামল কুট্টিমামা।

আগে আগে তিনজন–নুরেশ আলী, রেঞ্জার সাহেব আর বিপিন জানা। পেছনে পেছনে দু'জন; এরা দুজনেই বন-দপ্তরের লোক। আর এরই মাঝখানে পিংকিরা পাঁচজন। মোটামুটি একটা দলই বলা যেতে পারে। এ দল নিয়েই রেঞ্জার সাহেব এগিয়ে চলেছেন।

পিংকির ততক্ষণে কথা বন্ধ হয়ে গেছে। কাউকে কিছু জিজ্ঞেস না করে অবাক হয়েই শুধু জংগলের এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছে।

চারদিকে নাম-না-জানা অসংখ্য পাখির ডাক। মাঝে মধ্যে প্রজাপতি উড়ছে। এ ছাড়া অন্য কোনো শব্দ নেই।

যেতে যেতে পিংকি বারবারই মাথার ওপরে তাকাতে লাগল। লঞ্চ থেকে বাইনাকুলার চোখে লাগিয়ে বাঁদর দেখেছিল একটু আগে, কিন্তু এখন কোথায়ও কোনো বাঁদর নেই। গেল কোথায়!

ব্যাপারটা জানার জন্য বিপিন জানাকে জিজ্ঞেস করবে ভাবল পিংকি। কিন্তু বিপিনের কাছে চট করে যেতে পারছে না সে। জংগলে ঢোকার আগেই রেঞ্জার সাহেব বলে দিয়েছিল যে যেভাবে থাকবে, সেভাবেই হাঁটবে। খুব বেশি চেঁচামেচিও করতে পারবে না। কাজেই জোরে চেঁচিয়ে যে কিছু বলবে, তাও বলতে পারছে না। তাই চুপচাপই হাঁটতে লাগল পিংকি।

হাঁটছিল, হঠাৎ কী একটা দেখে একটু পরেই চমকে উঠল। তারপরেই ভালো করে দেখে বুঝল, দল ছাড়া একটি লোক। জংগলে ঢুকে গাছ কাটছে। কাঠ চুরি

গাছ কাটাদের নৌকো।

করতে এসেছে নাকি? তাহলে তো এবার ধরা পড়ে গেল–

মুখে কোনো কথা না বলে কুট্টিমামার হাত টেনে দৃশ্যটা দেখালো তাকে পিংকি। ততক্ষণে রেঞ্জার সাহেবেরও চোখে পড়েছে দৃশ্যটা। দেখতেই একটু দাঁড়িয়ে লোকটাকে ভালো করে পরীক্ষা করলেন তিনি। তারপরেই আবার এগিয়ে চললেন।

পিংকি অবাক হয়ে গেল। লোকটাকে হাতে নাতে ধরেও কেন যে কিছু বললেন না রেঞ্জার সাহেব তা বুঝতে পারল না। আর অদ্ভুত–লোকটাও যেন বোবা মেরে গেছে এত লোকজন দেখে।

কিন্তু লোকটাকে পেছনে ফেলে রেঞ্জার সাহেব এগোতেই এবার পিংকি কথা না বলে পারল না। ফিসফিস করে কুট্টিমামার হাত টেনে এনে জিজ্ঞেস করল, এ কী কুট্টিমামু লোকটা দিনদুপুরে কাঠ চুরি করছে, রেঞ্জার সাহেব দেখেও কেন কিছু বললেন না–

কুট্টিমামা বোধহয় দেখেনি। পিংকি দেখাতেই সেও চমকে উঠল। ততক্ষণে দেবাঞ্জন ও তড়িৎ মামাও অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছে।

ব্যাপারটা লক্ষ্য করে কানাই সরকার হঠাৎ খিক খিক করে হেসে উঠল। বিপিন জানাকে আস্তে করে ডেকে বলল, ও হে বিপিন দাঁড়াও–দাঁড়াও–ওই গাছকাটাকে দেখে নন্দুবাবুরা অবাক হয়ে পড়েছে। যাও ওর সংগে একটু পরিচয় করিয়ে দাও তো–

বলার আগেই কুট্টিমামার মুখে সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল। পিংকিদের দিকে তাকিয়ে বলল, না পিংকি ও আসল মানুষ নয়। নকল গাছকাটা। আমার একদম

খেয়াল ছিল না–

–তার মানে !

ততক্ষণে ওরা তিনজন–মানে দেবাঞ্জন, তড়িৎ আর পিংকিরা কেমন বোকার মতো তাকিয়ে আছে কুট্টিমামার দিকে।

কুট্টিমামা হাঁটতে হাঁটতে লোকটার সামনে এগিয়ে গেল, তারপর আঙুল তুলে দেখিয়ে বলল, বন-দপ্তর থেকে সম্প্রতি অনেক নকল গাছকাটাকে জংগলের ভেতরে বসানো হয়েছে। কারণ কী জানিস ! কারণটা হল,জংগলের প্রভুটি যাতে আসল গাছকাটাদের আক্রমণ না করে। কেননা এই নকল গাছকাটাটির ভেতরে ব্যাটারী দিয়ে একে চার্জ করে রাখা হয়েছে। জংগলের প্রভু একে দেখে যেই না আক্রমণ করবে অমনি এই বিদ্যুৎ মানুষটির গা থেকে বেরিয়ে তাকে 'শক্' মারবে। প্রভুও তখন পালিয়ে বাঁচবে। আর এরপর আসল মানুষ দেখলেও ভাববে বোধহয় বিদ্যুৎ-মানুষ। ফলে আসল মানুষরাও তার আক্রমণ থেকে রেহাই পাবে। এই বিদ্যুৎ-মানুষ জংগলে ছেড়ে দেওয়া মানেই গাছকাটাদের বাঁচানো।

আসল গাছকাটা, নকল নয়।

–তা এতে কী গাছকাটাদের কোনো উপকার হয়েছে ?

কুট্টিমামা বলার আগেই রেঞ্জার সাহেব তপন গাংগুলী বললেন, হ্যাঁ নিশ্চয়ই। উপকার তো হাতে হাতেই পাওয়া গেছে।

দেবাঞ্জন বলল, অদ্ভুত আইডিয়া। দাঁড়ান আমি এর একটা ছবি তুলি–

–না-না...এটা করবেন না–রেঞ্জার সাহেব দেবাঞ্জনের দিকে তাকিয়ে অনুরোধ করলেন, সরকারী ব্যাপার। এ সবের ছবি তোলা বারণ আছে। শুধু তা কেন জংগলে ঢুকে বন্য-জন্তুদেরও ছবি তোলায় আপত্তি আছে। কী করবো বলুন; আমি তো চাকরি করে–এটা আমাকে মানতেই হবে–

ক্যামেরার চামড়ার ঢাকাটা খুলে ফেলেছিল, আবার তা পরাতে পরাতে দেবাঞ্জন বলল, না ঠিক আছে, আপনি যখন বলছেন–

রেঞ্জার সাহেব আর কোনো কথা বললেন না। আস্তে আস্তে সামনে এগিয়ে চললেন।

সামনে জংগলে এখন আলো কমে এসেছে। রেঞ্জার সাহেব বিপিন জানাকে বললেন, নাও বিপিন এবারে তোমার খেলাটা দেখাও তো ?

–খেলা !

রেঞ্জার সাহেবের কথা শুনে পিংকিরা অবাক। জংগলে এসে আবার কী খেলা দেখাবে বিপিন জানা। কথাটা শুনে যে পিংকিই অবাক তাই নয়, কুট্টিমামা থেকে দেবাঞ্জন আর তড়িৎমামা প্রত্যেকেই এ ওর মুখের দিকে তাকাচ্ছে এখন।

ব্যাপারটা বুঝতে পেরেই তাই কানাই সরকার বলে উঠল, বিপিন খুব ভালো হরিণ-ডাক ডাকতে পারে নন্দুদা। এমন ডাকবে যে হরিণরা মনে করবে তার দলেরই কেউ তাদের ডাকছে।

–কই বিপিন শুরু কর। বেলা পড়ে আসছে। আর বেশি দূরে যাওয়া যাবে না। এদের নিয়ে তোমায় আবার ফিরতে হবে না !

বলেই রেঞ্জার সাহেব পিংকিদের জানালেন, সবাইকে এখন গাছের আড়ালে লুকিয়ে থাকতে হবে। বিপিন জানা হরিণের ডাক নকল করে ডাকলেই এদিকে হরিণেরা এসে পড়বে। কিন্তু দূর থেকে মানুষ দেখলে এদিকে আর আসবে না; তাহলে আর ভালো করে হরিণও দেখা যাবে না। কাজেই গাছের আড়ালে থাকাই ভালো।

কাছাকাছি দু'তিনটে ঝোপ এবং বড় বড় কতগুলো

বাণী আর আকাশমণি মাথা তুলে দাঁড়িয়েছিল–এর ভেতরে ঢুকলে আর বাইরে থেকে কাউকেই দেখা যাবে না।

রেঞ্জার সাহেবের কথামতো পিংকিরা সবাই মিলে সেখানে ঢুকল। কিন্তু অসম্ভব মশা; যত না মশা, তার চেয়ে পোকা-মাকড়ই বেশি। উড়ে উড়ে পিংকিদের গায়ে এসে বসছে। দু'একটা কামড়েও দিল। একটা তো পিংকির হাতে উড়ে এসে বসে এমন কামড়ে দিল যে সংগে সংগে জায়গাটা ফুলে চাক বেধে গেল। জ্বালা করছে প্রচন্ড। তবু চিৎকার করল না পিংকি। সবাই চুপচাপ।

ঠিক এমন সময় বিপিন জানা মুখটা ঘুরিয়ে হরিণের স্বর নকল করে ঠিক হরিণের মতোই ডেকে উঠল।

পিংকি চমকে উঠল। কী অদ্ভুত ডাক! হরিণেরা তাহলে এভাবেই ডাকে! আস্তে করে ঝোপের আড়াল থেকে সামান্য মাথা তুলল পিংকি। সামনের অল্প ফাঁকা জায়গাটায় কিছু নেই। হরিণ আসেনি এখনো একটাও। পিংকি আস্তে করে আবার মাথাটা নামিয়ে নিল।

হু হু করে হাওয়া বইছে। হাওয়াটা আসছে পিংকিদের সামনে থেকে। পিংকি শুনেছে শিকারীরা সবসময় হাওয়ার অনুকূলে থাকে। হাওয়ার বিপক্ষে থাকলে যে শিকার টের পেয়ে যাবে শিকারীর গায়ের গন্ধ–সেজন্যই এ ব্যবস্থা।

পিংকি ঘাড় ফেরালো।

বিপিন জানা এদিকে ওদিকে তাকিয়ে কী দেখছে; একটু পরেই আবার দেখেটেখে আগের মতো হরিণের গলার স্বর নকল করে ডাকতে শুরু করল।

কিন্তু এমনি দু'তিনবার ডেকেছে কি ডাকেনি হঠাৎ সে চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি রেঞ্জার সাহেবের কাছে হামাগুড়ি দিয়ে এসে বলল, স্যার টের পেয়েছেন?

রেঞ্জার সাহেবের মুখ চোখের অবস্থা দ্রুত বদলে গেল। দূরের জংগলের দিকে ভ্রূ-কুঁচকে তাকিয়ে কী দেখে পরেই আবার বিপিনের দিকে ফিরে বললেন, হ্যাঁ পেয়েছি। তবে–

বলে রেঞ্জার সাহেব আবার কী দেখে জানালেন, তবে সবাই আপনারা চুপ করুন এখন। কোনো শব্দ করবেন না। মহাপ্রভুর আগমন যেন পাচ্ছি–

পিংকি প্রথমে তেমন কিছু না বুঝলেও এটা অবশ্য বুঝেছিল যে কিছু একটা হয়েছে; না হলে হরিণ-ডাক

তরুণ বন্ধুদের জন্য

দেব সাহিত্য কুটীরের উপহার

উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমে অপরিহার্য সংগী

বাংলা ও ইংরাজির নতুন পাঠ্যসূচী অনুযায়ী

অধ্যাপক চ্যাটার্জী ও দত্ত মজুমদারের লেখা

NOTES ON H.S. ENGLISH SELECTIONS

(POEMS & PLAYS)

NOTES ON H.S. ENGLISH SELECTIONS

(PROSE)

উচ্চ মাধ্যমিক বাংলা সংকলন সহায়িকা

(গদ্য, কবিতা, নাটক, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস, ব্যাকরণ ও দ্রুতপঠন সহ)

দেব সাহিত্য কুটীর (প্রাঃ) লিমিটেড ২১, ঝামাপুকুর লেন, কলকাতা–৭০০০০৯

সজনেখালি পাখিরালয়।

ডাকতে ডাকতে হঠাৎ কেনই বা এমন থমকে গেল বিপিন জানা। তাছাড়া রেঞ্জার সাহেবই বা এমন চিন্তিত কেন! পিংকির সন্দেহ হল, তবে কি হরিণ নয়, বাঘের আগমন টের পেয়েছেন রেঞ্জার সাহেব! কি জানি–হয়তো কুট্টিমামাকে জিজ্ঞেস করলে জানা যেতে পারে। বনজঙ্গলে ঘোরে। এমন কতই তো অভিজ্ঞতা আছে।

কিন্তু পিংকি কিছু জানার আগেই একটা প্রচন্ড শব্দে সে কেঁপে উঠল। গুড়ুম–গুড়ুম–

রেঞ্জার সাহেব তাঁর বন্দুক চালিয়েছেন। পিংকি ভয়ে প্রায় চোখ বুজেই ফেলল। শুধু সে-ই নয়, ততক্ষণে তড়িৎমামা ও দেবাঞ্জনমামাও কেমন যেন চমকে উঠেছে। এমনকি কানাই সরকার ও কুট্টিমামাকেও কেমন উত্তেজিত দেখাচ্ছে।

সামান্য একটু সময় নিস্তব্ধতা। একটু পরে জঙ্গলের দিকে তাকিয়ে রেঞ্জার সাহেব বললেন, কই আসুন–এসো পিংকিবাবু...সুন্দরবনের রয়েল বেঙ্গল দেখবে না–

মুহূর্তেই বুকটা আনন্দে কেঁপে উঠল পিংকির। তাহলে একটু আগে গুলি করে বাঘই মেরেছেন রেঞ্জার সাহেব।

পিংকি বলে উঠল, বাঘটা কি মরে গেছে রেঞ্জার কাকু?

ব্যাপারটা বোধহয় ততক্ষণে সবাই জেনে গেছে। পিংকি বলতেই তাই দেবাঞ্জনমামা জানাল, না ছোট্টু বাবু, বাঘকে গুলি করেছে ঠিকই তবে মারার জন্য নয়। গুলি করে ঘুমের ইঞ্জেকশান দিয়েছে ঢুকিয়ে। আর বাঘটাও তাই ঘুমে ঢলে পড়েছে। একঘন্টা বাদে আবার ঘুম থেকে উঠে জঙ্গলে চলে যাবে। এই সুযোগ। চল ছোট্টুবাবু দেখে আসি।

একটা প্রায় ফাঁকা জায়গায় গাছপালার ওপরেই বাঘটা পড়ে আছে। বিরাট মুখটা একপাশে কাত করা। গায়ের ডোরা কাটা দাগগুলো চকচক করছে। গলার কাছটা থিরথির করে কাঁপছে।

দেবাঞ্জন রেঞ্জার সাহেবের কাছে গিয়ে আর একবার অনুরোধ করল একটা ছবি তোলার জন্য। কিন্তু সাহেব অটল। ছবি কিছুতেই তুলতে দিলেন না।

প্রায় মিনিট দশেক থাকার পর রেঞ্জার সাহেব বললেন, দিন–সন্ধে হয়ে আসছে। এবার ফিরি চলুন। আপনাদের আর হরিণ দেখাতে পারলাম না। হরিণ ডাকছে ভেবে বাঘটা এসে পড়ল। ঠিক আছে–বলে দেবাঞ্জনদের দিকে তাকিয়ে সাহেব জানালেন, নেমন্তন্ন রইল। আবার আসবেন। তবে একটা খবর দিয়ে। দেখবেন কত কিছু দেখাবো ঘুরিয়ে।

হাঁটতে হাঁটতে রেঞ্জার সাহেব সামনে এগোতে লাগলেন। পেছনে পেছনে পিংকিরা সবাই।

এবার ফেরার পালা। সন্ধে হয়ে আসছে। সেই সঙ্গে ঠান্ডা বাতাসও বইতে শুরু করেছে হু হু করে। এখন রওনা হলে সজনেখালি পাখিরালয়ের জেটিতে পৌঁছতেই সন্ধে হয়ে যাবে। এর পরে আছে আবার পাখিরালয় থেকে গোসাবার ঘাটে পৌঁছানো। বাড়ি পৌঁছতে পৌঁছতে ঠিক রাত হয়ে যাবে।

তা হোক, তাতে তেমন কষ্ট নেই পিংকির। কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল ফেরার কথা ভেবে। সেই কখন উঠেছে। কোন কাকভোরে। আর সারাদিন ধরে ঘুরতে ঘুরতে নানারকম দেখতে দেখতে কোন দিক দিয়ে যে সময় কেটে গেল বুঝতে পারেনি। এবার ফেরার কথা মনে হতেই পিংকি বুঝল, কী জানি হয়তো কালই ফিরে যেতে হবে।

ভাবতেই একটু উসখুস করছিল পিংকি। কিন্তু কুট্টিমামার নজরে পড়তেই ওকে কাছে টেনে নিল সে।

–কী রে, মন খারাপ হয়ে গেল দেখছি। না মন খারাপ করিস না। কাল তো আর ফিরছি না। কাল রেস্ট। পরশু আবার রওনা হব সাতজেলিয়ার দিকে। ওখান থেকে আরও আরও অনেক দূরে। সেই কালিন্দী আর রায়মঙ্গল নদীর বুকে।

বেশ মুষড়ে পড়েছিল। আবার মুহূর্তেই উত্তেজিত হয়ে উঠল পিংকি। যাক্, তাহলে কালই ফিরে যাচ্ছে না তারা। এখনো অনেক জায়গায় ঘুরবে। অনেক জিনিস দেখবে।

নতুন জায়গার স্বপ্নে বিভোর হয়ে আস্তে আস্তে সবার সঙ্গে এখন লঞ্চে ওঠে পিংকি।

[শেষ]

ছবি : দেবাশিস রায়

গৌরীকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার প্রথম পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা।

বিলাস ও অন্ধ ভিখারী

স্বপন রায়

রোপওয়েজ কলোনির অনতিদূরে প্রসাদপুর গ্রাম। সেখানে শিবের গাজন হচ্ছে। বিলাস তার মা-বাবার সংগে ঐ কলোনিতে থাকে। ঐ প্রসাদপুর থেকে গাজনের ঢাকের আওয়াজ ভেসে আসছে। বিলাসের মনটা আনন্দে নেচে ওঠে। গাজনের পরের দিন চড়ক। প্রসাদপুরে চড়কের মেলা বসে। বিলাস প্রতি বছর তার মা-বাবার সংগে ঐ চড়ক মেলায় যায়। বিলাস আগামী-কাল তার বাবার সংগে মেলায় যাবে।

এবারে রবিবারে চড়কের দিন পড়েছে। বিলাস তাই সকালেই স্কুলের পড়া আর হোম-টাস্ক সেরে নিয়েছে। সারাদিন মনটা মেলা দেখার আনন্দে ভরপুর। শুধু মনে হচ্ছে কখন দুপুর গড়িয়ে বিকেল আসবে।

পড়ন্ত বিকেলের আলোয় বিলাস তার বাবার সংগে প্রসাদপুরে চড়কের মেলা দেখতে চলল। লাল কাঁকর ছড়ানো রাস্তা। রাস্তার পাশে পাশে বিভিন্ন রকমের গাছ। কাছাকাছি একটা গাছের পাতার আড়ে লুকিয়ে কি একটা পাখি ডাকছে। বিলাস ঐ ডাকটা শুনে তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করল, ওটা কি পাখি শিস দিচ্ছে বাবা? সোমনাথবাবু বিলাসকে বুঝিয়ে দিলেন ঐ পাখির কি নাম, দেখতে কেমন, কোথায় ডিম পাড়ে সব কিছু। হঠাৎ লাল ফুলে ভরা একটা গাছ এই সূর্যাস্তের বেলায় দারুণ সুন্দর হয়ে উঠেছে। বিলাস বাবাকে জিজ্ঞাসা করে জেনে নিল ওটা কৃষ্ণচূড়া গাছ। তার মনে পড়ে গেল স্কুল-গেটের সামনে ঠিক ঐ রকম ফুলে ভরা একটা গাছ আছে। এতদিন তার নাম অজানা ছিল, আজ জানা হয়ে গেল। বিলাসরা যত মেলার কাছাকাছি আসতে লাগল, ঢাকের আওয়াজ তত যেন বেড়ে যেতে লাগল। মেলায় হঠাৎ তার সহপাঠী পল্টুর সংগে দেখা হয়ে গেল। পল্টুও তার মা-বাবার সংগে মেলায় এসেছে। স্কুলের গণ্ডির বাইরে পল্টুকে দেখে বিলাসের মন আনন্দে ভরে উঠল।

মেলার ভিড় বেশ জমে উঠেছে। কত রকমের মনোহারী আর মাটির পুতুল ও মূর্তির দোকান বসেছে। একটা সিলিণ্ডারে বাঁধা কতগুলো বেলুন আকাশের দিকে মুখ করে উড়ছে। একটু দূরে পুতুলনাচ হচ্ছে। সেখানে মঞ্চের উপর মুখোশ পরে একটা ছেলে গানের তালে তালে নেচে নেচে দর্শকদের হাসাচ্ছে। অদূরে বনবন করে নাগরদোলা উঠানামা করছে। ওখান থেকে ওরা চড়কের জায়গায় চলে এল।

চড়কে ঘোরা এখনও শুরু হয়নি। তবে জোরে ঢাক বেজে চলেছে। জমায়েত হয়েছে বহু দর্শক। একটু দূরে সোমনাথবাবু বিলাসকে নিয়ে দাঁড়িয়ে তার এক পরিচিত বন্ধুরসংগে কথা বলছিলেন। বিলাসের মনটা অনেকক্ষণ

থেকে ঐ সব খেলনার দোকানে টানছিল। সে তার বোন মিলুকে একটা পুতুল কিনে দেবে বলে মায়ের কাছ থেকে দুটো টাকা চেয়ে এনেছিল। গত বছর ঐ রকমই একটা দোকান থেকে রবীন্দ্রনাথের মাটির মূর্তি কিনে নিয়ে গিয়েছিল।

ঘুরতে ঘুরতে এক সময় সে মেলার শেষ প্রান্তে এসে পৌঁছেছে। এর পর ফাঁকা মাঠ। সরু এক ফালি রাস্তা মাঠের বুক চিরে এঁকেবেঁকে চলে গেছে। একজন অন্ধ ভিখারী হেঁটে আসছিল ঐ মাঠ দিয়ে। কাঁধে ঝোলা আর হাতে একটা লাঠি। বিলাস তার বইয়ে একটা অন্ধ ভিখারীর যেমন ছবি দেখেছে ঠিক তেমনই। কিন্তু এ কী! লোকটা যে ভুল পথে যাচ্ছে। ওখানে জলসেচের জন্য এক বিরাট নালা। ভিখারী প্রায় নালার কাছাকাছি পৌঁছে গেছে। বিলাস দৌড়ে গিয়ে তার হাত ধরে থামিয়ে দিল। ভিখারী চমকে উঠে বলল, কে! অন্ধ চোখ দুটো কি যেন খোঁজার চেষ্টা করছে।

–আমি বিলাস, ঐ কলোনিতে থাকি, তোমার সামনে বিরাট নালা, পড়ে যেতে। কোথায় যাবে তুমি?

–আমি ঐ শিমুলডাঙায় থাকি। প্রসাদপুরের রাস্তায় তো চড়ক মেলার ভিড়, তাই এ রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি। কিন্তু এখানে তো নালা ছিল না।

–নতুন একটা নালা কাটা হয়েছে সামনেই। তুমি আর একটু হলেই পড়ে যেতে।

ভিখারী হাতের লাঠির সাহায্যে রাস্তা ঠিক করার চেষ্টা করে।

তা দেখে বিলাস বলল, আমি তোমাকে নালাটা পার করে দেব?

বিলাস ভিখারীর হাত ধরে নালার মধ্যে নেমে পড়ে।

–তোমার ঝোলাটা খালি, তোমাকে কেউ ভিক্ষা দেয় নি?

–না বাবা, গাঁয়ে আজ চড়কের মেলা তার উপর সংক্রান্তি। তাই কেউ ভিক্ষা দেয় নি। ভিখারী লাঠিটা শক্ত করে ধরে।

বিলাস মনে মনে ভীষণ দুঃখ পেল। কত লোক চড়কের মেলায় আনন্দ করছে। আর কেউ চড়কের দিন বলে অভুক্ত থাকছে। সে পকেট থেকে তার টাকা দুটো বার করে ভিখারীকে দিল, নাও, তুমি এটা দিয়ে আজ খাবার কিনে খেয়ো।

ভিখারীর দ্বিধা দেখে বিলাস জোর করে তার ঝোলায় পুরে দিল। তারপর ভিখারীকে ধীরে ধীরে নালা পার করে শিমুলডাঙার রাস্তা ধরিয়ে দিল। চড়কের মেলায় তখনও গাজনের ঢাক বাজার আওয়াজ একটানা বাতাসে ভেসে আসছে।

ছবি ঃ দিলীপ দাস

রায় বাগান স্ট্রীট, কলিকাতা ৬, থেকে শ্রীমতী স্বপ্না পাল তাঁর স্বর্গত পুত্র সুস্মিত পালের নামে একটি সাহিত্য প্রতিযোগিতা আহ্বান করছেন।

তাঁর প্রস্তাব অনুসারে আমরা

সুস্মিত পাল স্মৃতি সাহিত্য প্রতিযোগিতার জন্যে মৌলিক লেখা পাঠক পাঠিকাদের কাছ থেকে চাইছি।

বিষয়বস্তু ঃ

এক জাতি, এক প্রাণ, একতা

সুস্মিত পাল

জন্ম–১২ই ফাল্গুন, ১৩৭৬

মৃত্যু–২৩শে আশ্বিন, ১৩৮৪

১ম পুরস্কার–২৫ টাকা

২য় পুরস্কার–১৫ টাকা

লেখা পাঠাবার শেষ তারিখ–৩০শে কার্তিক। প্রতিযোগিতার ফলাফল আগামী মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত হবে।

গৌরীকান্ত চট্টোপাধ্যায় স্মৃতি সাহিত্য
প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত লেখা

কেন ?

সুব্রত মজুমদার

চৈত্রের দুপুর। ঘরে বসে একা একা খেলছিল বিলু। হঠাৎ ঢাকের শব্দে চঞ্চল হয়ে উঠল তার মন। এক ছুটে বাইরে চলে এল সে। এসে দেখল ছোটখাট একটা দল ঢাক বাজিয়ে তাদের বাড়ির সামনে হাজির। তাদের কারো কারো মাথায় লাল কাপড়ে জড়ানো কাঠের 'কি একটা'। কয়েকজন আবার শিব, দুর্গা প্রভৃতি সেজেছে। তারা খানিকক্ষণ নাচল। তাদের নাচ দেখে বিলুর খুব মজা লাগছিল। এক ফাঁকে দৌড়ে ঘরে গিয়ে টানতে টানতে মাকে নিয়ে এল সে। মা তাদের ভিক্ষা দিলে তারা পথে পা বাড়াল।

ঘরে এসে মায়ের গলা জড়িয়ে ধরল বিলু। জিজ্ঞেস করল, ওটা কী মামণি ?

বিস্মিত মেনকাদেবী বললেন, ওটা, কোনটা রে ?

ঐ যে লাল কাপড় মোড়ানো।

এবার হাসির পালা বিলুর মা মেনকাদেবীর। কিন্তু বিলুরই বা দোষ কি ? সে তো সবে সাত বছরে পড়ল। তার উপর শহুরে ছেলে, তবু সব কিছু তার জানা চাইই চাই। হাসতে হাসতে মেনকাদেবী বললেন, ওটা পাটঠাকুর। চৈত্র মাসের শেষ দিনে ঐ ঠাকুরের পূজা করা হয়। এই পূজাকে নীলের উৎসব বা গাজনের উৎসব বলে। তখন গ্রামে-শহরে মেলা হয়, যাকে আমরা বলি চড়কের মেলা।

বিলুর মন কিন্তু এতে শান্ত হলো না। রাত্রে খাওয়ার পর বিছানায় সে বাবাকে আবার জিজ্ঞেস করল, বাবা, চড়ক কী ?

বাবা বললেন, চৈত্র মাসের শেষ দিনে যে নীলকণ্ঠ শিব পূজার উৎসব হয় তাকে গাজনের উৎসব বলে।, একে চড়ক পূজাও বলা হয়। শিব নাকি শ্রাবণ মাসে জন্মেছিলেন, আর বিয়ে করেছিলেন চৈত্র মাসের শেষে। বিয়ে হয়েছিল নীল চণ্ডিকার সংগে। তাই তো চৈত্র মাসের শেষে আমাদের মেয়েরা-মায়েরা নীলের উপোস করে। আর তার সংগে গাজন উৎসব শুরু হয়। শিবের বিয়েতে সন্ন্যাসীরা ছিলেন বরযাত্রী। বরযাত্রীরা মাঝে মাঝে গর্জন করতেন। সেই 'গর্জন' থেকে 'গাজন' শব্দটা এসেছে।

আবার কেউ কেউ বলেন অন্য কথা। গাজনের শেষ দিনে হয় চড়ক। মাটিতে চড়কের গাছ পুঁতে তার মাথায় আড়ভাবে একটা বাঁশ এমনভাবে বাঁধা হয় যাতে পাক খাওয়া যায়। আগে সন্ন্যাসীরা পিঠে লোহার বড় বঁড়শি বিঁধিয়ে বাঁশের শেষ অংশ থেকে ঝুলে পাক খেত। এই নৃশংস প্রথাটিকে ইংরেজ সরকার ১৮৬৫ সালের ১৫ই মার্চ আইন করে বন্ধ করেন। তখন থেকে সন্ন্যাসীরা বুকে গামছা বা কাপড় বেঁধে চড়ক গাছে ঘুরপাক খেতে আরম্ভ করেন। চড়কের গাছটি হওয়া চাই শক্ত। নচেৎ ভেঙে পড়তে পারে। তাই শাল বা গর্জন গাছের একটি খুঁটি বছরখানেক পুকুরে জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। গাজনের আগের দিন ভক্তরা সেই খুঁটি জল থেকে তুলে বেশ করে তেল মাখিয়ে মাটিতে পোঁতে। একে বলে গাছ জাগানো। এই গর্জন গাছের সাহায্যে অনুষ্ঠান হয় বলেই হয়ত উৎসবের নাম 'গাজন'।

আবার বর্তমান কালের কোনো কোনো পন্ডিত বলেন, সার্বজনীন ভাবনা থেকে গাজন শব্দের উৎপত্তি। গ্রামের সকলে মিলে এই উৎসব করে বলে এই উৎসবের নাম 'গাজন'। গ্রাম + জন > গাঁ + জন > গাজন।

ছবি : দিলীপ দাশ

হাঁদা-ভোঁদার

কষ্ট কাহিনী

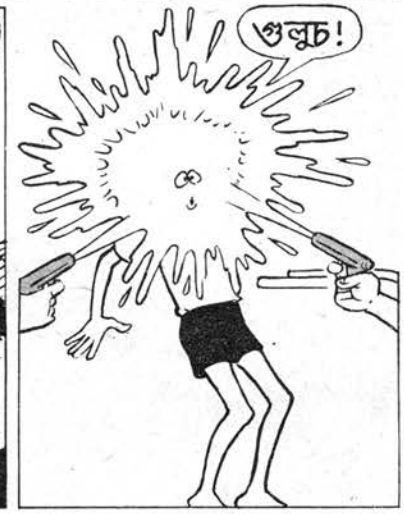

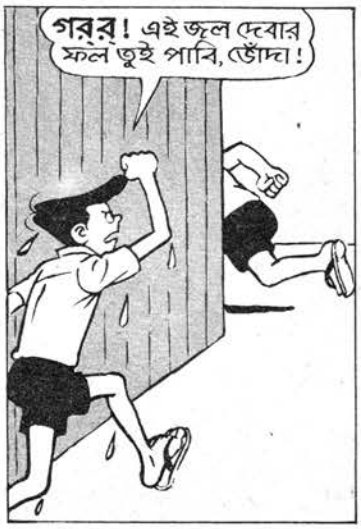

ওয়াক! থুঃ!
হাঃহাঃ! ভুল করে ও একটা আগুন নেভানো বস্তু ধরেছে!
বাহ্! ভোঁদা আমার ঠ্যালা-গাড়িটা নিয়ে গেছে, কিন্তু আমি এই চাকার দাগ ধরে ওকে ধরবো!
গরর! ঠ্যালাগাড়িটা আমাকে দিয়ে দে!
মরেচে! ও ঝাঁপিয়ে পড়ার আগেই সটকে পড়তে হবে!
অ্যাইও!
হিঃহিঃ! ও একেবারে গড়ানে রাস্তায় পড়েছে!
ওরে বাবা! আমি এটা থামাতে পারছি না!
গেছি রে!
দড়াম!
যে ছেলেটা জ্বালানি কাঠ বিক্রির কাজ নিয়েছিলো সে আপনার ঠ্যালা ভেঙে খেলা করছে!
গরর! আমার নতুন ঠ্যালাগাড়িটার যে হাল করেছিস আয় তোকেও ঐ অবস্থা করে মনের ঝাল মেটাই!
গোঁ গোঁ!

নতুন ধাঁধা

[১] শেষ দুইয়ে মাপি এসো
প্রথম শেষে করি এসো।
সবে মিলে কি বলতো
লিখেই দেখি চলো তো।।
–সোমালী ভট্টাচার্য/ধ্রুবেশ
চ্যাটার্জী লেন, উত্তরপাড়া

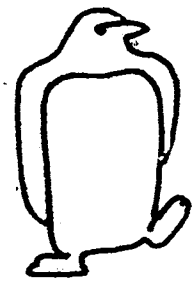

[২] সর্বত্র আছেন যিনি
মধ্য ছেড়ে হন তিনি
যাত্রাকালের সাথী,
মাথা কেটে এই খেলাতে
সময় ভুলে মাতি।
–শম্পা রায় ও শান্তিরঞ্জন দে।
তিলজলা, কলকাতা-৩৯

[৩] আগে পিছে নত মানে
'হব' হবে মাঝখানে,
প্রথম ভাগ নও
যদি সানাই তারে কও।
–শংকর ভট্টাচার্য/জিয়াগঞ্জ
মুর্শিদাবাদ

[৪] চতুষ্পদে মাথায় রাখি,
পেটেতে বাঁধিয়া প-টি
ন-টিরে দেখিয়া অন্তে
দিও না কাউকে জানতে।

–তুষারকান্তি কোনার/কয়লানগর
ধানবাদ

শ্রাবণ সংখ্যার ধাঁধার উত্তরঃ
[১] সুবললাল বসু [২] বাদাম
[৩] কলহ [৪] নিমেষ

বৈশাখ সংখ্যার ধাঁধার সফল উত্তরদাতাদের নামঃ

।। কলকাতা ।।

পার্থ, মৌমিতা, শীলা, শিখা/পাটবাড়ি লেন, কল–৩৫; বাণীব্রত, জয়ন্ত, মিনুদি/আমহার্স্ট স্ট্রীট, কল–৯; সংগিতা হোড়/বিবেকানন্দ রোড/কল–৬; তাপস ও অমিত/জে.কে. পাল রোড, নিউ আলিপুর; কল–৩৫; অর্ঘ্য পাল ও অসীম পাল/প্রিয়নাথ চক্রবর্তী লেন, কল–৩৫; দীপ্তি চন্দ্র, শাশ্বতী চন্দ্র/ঠাকুরপুকুর, কল–৬৩; দীপাংশু ঘোষ/রাসবিহারী এভিনিউ, কল–১৯; মুনিয়া, বুনি, ছোড়দি, দাদা, বৌদি, দিদি, গান্ধীদা, শুভেন্দুদা/বীরপাড়া লেন, কল–৩০; কিংশুক মজুমদার/রাজা দীনেন্দ্র স্ট্রীট কল–৯; সুতপা, স্বাতী, শুভ্রা ও দিবাকর/হরিশ মুখার্জী রোড, কল–২৫; ছোটকা, পমি, তৃতাই, ঝুম/কল–৯; অভিষেক ও অরুণিমা চ্যাটার্জী/সাউথ সিঁথি, কল–৩০; সৈকত ও মৈনাক সেন/সেলিমপুর রোড, কল–৩১; অজন্তা ও অন্তরা দত্ত/হিন্দুস্থান পার্ক, কল–১৯; অর্পণ, অনির্বাণ, অম্লান, অন্তরা/যতীন দাস রোড, কল–২৯; বাবলু, মাণ্টু, মিঠু, চুমকি, টুবাই/সুরেন সরকার রোড, কল–১০; আশিস, বরেন ও গৌতম/বি.এন.আর অফিস/কল–৪৩; সুশান্ত ও শম্পা দত্ত/মনোহরপুকুর রোড/কল–২৫; মিঠু, মৌ, বান্দা, পাপুন/কল–৩; তৃহিনা মিত্র/সল্ট লেক, কলকাতা–৬৪; সুতপা, সুজাতা, সুনীপা দাশগুপ্তা/ব্রাহ্মসমাজ রোড, কলকাতা–৬০; নূপুর, মধুছন্দা, মহাশ্বেতা, স্বপ্নাঞ্জন, দৃপ্তাঞ্জন ও ঈশাঞ্জন সাহা/বিজয়গড়, কল–৩২; সুখেন্দু, শ্রীলেখা, দক্ষিণী ও সুদক্ষিণা ভট্টাচার্য/কলকাতা–১০; কমল, মীরা, মিম্মি ও মিতিল/নিমতলা লেন, কল–৬; সজল, শিল্পী ও সায়ন্তী মজুমদার/এন.জি. বসাক রোড, দমদম–৪০; শর্মিলা, বুলু, তরুণ ও পংকজীনি গৃহ/যাদবপুর, কল–৩২; সন্দীপ সোম/পশ্চিম বড়িশা গভঃ হাউসিং এস্টেট/কল–৬৩; ঝুমুর ও সঞ্জয় সেনগুপ্ত/পর্ণশ্রী, কল–৬০; দীপাঞ্জলি, সোমা, শুভংকর, পার্থ ও গৌতম/পটলডাঙা স্ট্রীট, কল–৯; রাজু, মৌ, মালা, রেশমী ও তুলি/বিধান শিশু উদ্যান, কলকাতা; নবকুমার, তপতী, অয়ন ও মৌসুমী/সল্ট লেক সিটি, করুণাময়ী; দেবেন্দ্র, রবীন্দ্র, প্রেমেন্দ্র, মানবেন্দ্র, অমল, কমল, উৎপল ও সুদীপ্ত নাগ/জপুর রোড, কল–৭৪; রক্তিম, ধীমান, গার্গী, হিন্দোল ও রাজীব/দুর্গাপুর লেন, কল–২৭; বাবা, মা ও সব্যসাচী সরকার/নীলগঞ্জ রোড, কলকাতা–৫৬; দাদু, দিদা, চুমকি দিদি ও অতনু নন্দী/বরানগর, কল–৩৬; সৃজয়, পাপিয়া, অংশুমান, অরিজিৎ/বেহালা এয়ারপোর্ট, কল–৪০; সৃজাতা, সুতপা, সুমনা, সংগীতা বসু ও শংকর দে/শরৎ বসু রোড, দমদম ক্যান্টনমেণ্ট, কল–৬৫; রাইলি রায়/লেক গার্ডেন্স, কল–৪৫;

।। ২৪-পরগনা ।।

অলকা, অরিন্দম, দীপঙ্কর মিত্র/নহাটা; নুলো, অমল, কুমার, নেংটি, দাদু ও চম্পা দে/পলতা; সোমা দাস/সদর বাজার, ব্যারাকপুর; অনিন্দ্য, অরুন্ধতী, অরিন্দম ও অমিয় সেনগুপ্ত/হরিতলা, বারাসত; শিল্পী লিপিকা, দেবিকা, গৌরী রক্ষিত, মা ও বাবা/হালিশহর রেল কলোনী নর্থ, নবনগর; সুমন, সুদীপ, স্বপ্না, অসীম, মামণি ও শুভ/ বাদুড়িয়া; দীপঙ্কর, পপুলাদিদি, মা, বাবা, বুড়ি দি ও বলামামা/সুভাষনগর, সোদপুর; পার্থ, মহুয়া, কৃষ্ণা সমাদ্দার/হৃদয়পুর; পিংকু, সন্তু, রাজু, নলা ও বাপী/বসিরহাট; বাবা-মা, মাসি, মুকুল, লীলা, মানিক, রীণা, মীনা, মৈত্রেয়ী, চুমকি/হালদারপাড়া, বজবজ; ভাস্কর, শান্তা, শ্রাবণী ও বাবা-মা/বারাসত; সুতপা, শুভ্রা, বুড়ি, গোপীনাথ, টুলু ও বাবুয়া/উস্থি; মলি, মালা, রাধা, পার্থ, মা ও বাবা/রবীন্দ্র পল্লী, গড়িয়া; সৌমিত্রিশংকর ও সুগতশংকর/ ব্যারাকপুর; সৌমিক, রবীন, দেবজ্যোতি, সুপ্রিয়, সর্বাণী/পাণিহাটি; দীপঙ্কর রায়/দক্ষিণ চাতরা; অনু, রুনু, ঝুনু, তন্বী/পানিহাটি; বনানী মুখোপাধ্যায়/শিবতলা, নোনাচন্দনপুকুর; বাপী, ছট্টু, মিণ্টু, মা-বাবা, বৌদি ও সৈকত/ইছাপুর, নবাবগঞ্জ; সোমনাথ ভট্টাচার্য/নবজীবন কলোনী, কিশোরপাড়া; পিকুল, পিংকু, প্রণব, পিকলু, স্বপন, বিভু ও মিণ্টু/চাঁদপাড়া; দেবাঞ্জন, অঞ্জনা, রেখা ঘোষ ও জয়ন্ত কর্মকার/ব্যারাকপুর; মিনতি, শিশির, পীযূষ, ভাস্বতী ও তপস্বী/বোড়াল; দিলীপ সেনগুপ্ত, শতরূপা কুণ্ডু ও অনিন্দ্য চ্যাটার্জী/কাঁচরাপাড়া;

।। হাওড়া ।।

সুদীপ্ত মিত্র ও সুকুমার কোলে/কলুপাড়া লেন, হাওড়া–৬; রমেশ ও নির্মলেন্দু ঘোষ/ডোমজুড়, বারুইপাড়া; চান্দ্রেয়ী, স্বর্বেন্দু, শৈবাল, ববি, পিংপং ও লিপ্টন/কাসুন্দিয়া রোড, হাওড়া–৯; গোলাপ, ভ্রমর, চিরঞ্জীব ও মানসী/বি. গার্ডেন; সোনা, রাণা, কাকলি, সাধনা, খোকন, বাপ্পা/ বি. গার্ডেন; সুব্রত, দেবব্রত, রৈবত, বাবাই ও মামণি/মাকালতলা, দুর্গাপুর, হাওড়া; মামা, মামীমা, গোপা, বাপ্পা, বাবুন, মুনমুন ও রজত/পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া–১; রত্না, শর্বরী, বুলু, শ্যামল, অরুণ, শিখা, পুতুল, সুপ্রভাত, মা ও বাপী ভট্টাচার্য/নিউ জেনিন্স রোড, লিলুয়া; বাবা-মা, টুকু, খোকন/রামরাজাতলা, হাওড়া–৪; মা, বাপী, মৌসুমী, মহুয়া, পাপড়ি, পারমিতা ও সৌরভ বসু/শিবপুর, হাওড়া–২; সন্দীপ, বাপি ও ঝুমঝুম/নরসিংহ দত্ত রোড, হাওড়া–১; মীরা, বিমান, রীতা, সব্যসাচী ও মামন মুখার্জী/গণেশ চ্যাটার্জী লেন, শিবপুর; বন্দনা, শোভন, রূপা, অশোক, টুটুন ও ঝুমা নন্দী/দেউলটি, হাওড়া; শিখা, সুদীপ্ত, সুব্রত, নির্মলদা ও বাবা-মা/মধুসূদন পাল চৌধুরী লেন, হাওড়া–১; মণ্টো, সণ্টো ও সীমান্ত ব্যানার্জী/হালদারপাড়া লেন, হাওড়া; বাপী, মা, দাদা, বড়দি, ছোড়দি, নিমাইদা, বড়দা, জয়ন্ত ব্যানার্জী/মাজু; অনন্যা, অর্চনা ও অঞ্জনা ঘোষ/শরৎ দত্ত লেন, কদমতলা, হাওড়া–১;

।। হুগলী ।।

ইন্দ্রনীল ও বেদব্রত চ্যাটার্জী/চন্দননগর; মুন্নি, টবলু, টুম্পি, তোতন, বুবাই ও তিন্নি/শ্রীরাম; সঞ্চিতা, শেলি, রাজু, মানিক, কানু ও সৌরেন/চণ্ডীকুণ্ডমাঠ, শেওড়াফুলি; মঞ্জুরা, মিনারা, মিঠু, জসীম ও জাহাঙ্গীর/ডানকুনী; শুভ্রা, তন্দ্রা, রিক্তা, অপূর্ব, সজল, মা ও বাবা/শেওড়াফুলী; দীপা বসু ও সীমা বসু/বৈদ্যবাটি; মা, শুভ্র ও শাশ্বী গাঙ্গুলী/নিত্যানন্দপুর; খোকন, রঞ্জু, মা, চন্দন ও শশীকলা/কোলডিপো, শেওড়াফুলী; বড় মামণি, মেজ মামণি, পিকু ও সুমন/ এল.এম. ভট্টাচার্য লেন, শ্রীরামপুর; বাপী, বাবি, বড়া, বুড়ো বিলু ও বুবাই/ভদ্রকালী, উত্তরপাড়া; বাবা, মা, রমা, অচিন্ত্য, প্রশান্ত, নমিতা ও জয়ন্ত ঘোষ/আরামবাগ; বাবা-মা, রুনা, রানা ও রেণুগুপ্ত/ আরামবাগ; শিখা হোতা ও শ্রাবণী ঘোষ/আরামবাগ নেতাজী মহাবিদ্যালয়; অশোক, সুনীতি, সুরঞ্জনা, ঈশান/শ্রীরামপুর; সুপ্রকাশ, সুপ্রসন্ন, সুপ্রবুদ্ধ, সুপ্রতিম ও অন্যান্যরা/কানাইপুর; কিরণ মান্না/বৈদ্যবাটি; অজয়, মণিমালা, সংহিতা/ডানলপ, সাহাগঞ্জ; চুণী, পান্না, প্রবীর ও অন্যান্যরা/ছাত্রসমাজ, শেওড়াফুলী; ইলা, লক্ষ্মী, ভবানী, আহ্লাদী, সীমা ও সোমা/ শেওড়াফুলী; বুজু, সুজু, বাবলু, বাবু, নন্দন/জি.এন. মুখার্জী রোড/বাঁশবেড়িয়া; জয়দীপ বসু রায় ও বাবা-মা/পি.ডি. কোয়াটার্স, চুঁচুড়া; সুপ্রিয়া ও সুপর্ণা নন্দন/হরিপাল; ছাত্রছাত্রীবৃন্দ/ময়-বাড়ি প্রা: বিদ্যালয়; লোপামুদ্রা, দেবযানী, সৈকত ও সুবীর নন্দন/মাঝের সড়ক, বাঁশবেড়িয়া; প্রদীপ ও মিনতি দে/ব্রেথওয়েট কোয়ার্টার, এ্যাঙ্গাস; রিম্পি, টিটো, মুনাই, কবিতা, টিঙ্কু ও রীণা দে/রামকৃষ্ণ রোড, রিষড়া; বাবা-মা, রিঙ্কু, টিঙ্কু ও অনল মুখার্জী/চুঁচুড়া স্টেশন কোয়াটার্স; পুলক, তিলক, জয়ন্ত ও করবী চক্রবর্তী/ডানকুনি; শৈলেন, চন্দ্রচূড়, চিরঞ্জীব, প্রসেনজিৎ, মদন, অতনু, অঞ্জনা ও মাণ্টাই দে/চকবাজার সোনাটুলি লেন; স্বাতী, রুমকি ও চাঁদ/শেওড়াফুলী;

।। বর্ধমান ।।

সলিল, গোবিন্দ, মুকুন্দ, উৎপল, উমা, রাজু, রমা, সীমা হালদার ও রমেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য/বেড়ুগ্রাম; তপন খাঁ, গৌতম অধিকারী ও অন্যান্য/স্টেট ব্যাঙ্ক; শ্যামল বিশ্বাস/সোনামুখী; বাবা-মা, অনুপ ও জলি/বার্ণপুর; বিকাশ, কল্পনা, কাবেরী, দেবাশিস ও পলাশ নন্দী/লোকো কলোনী, আসানসোল; সব্যসাচী ও শান্তনু মুখার্জী/তিরাট; কৌশিক ও বাবা/কল্যাণপুর, আসানসোল; আশিস, শিশির ও গোকুলচাঁদ দত্ত/নূতনগঞ্জ; রিণ্টু, শিঞ্জু, মাসি ও মা-বাবা/বার্ণপুর; ঊর্মি ও উপল/দুর্গাপুর–৫; রাজদ্বীপ ও মধুপর্ণা/হিল কলোনী, রাস্তা–১০, চিত্তরঞ্জন; সুব্রত দে/কোক ওভেন কলোনী, দুর্গাপুর–২; অমিতাভ, দিপালী, সুলেখা, কবিতা, মা ও বাবা/বিধাননগর হাউজিং কলোনী/দুর্গাপুর–৬; ঊসষী, কৌশাম্বী, তন্নিষ্ঠা, মীরা ও অন্যান্যরা/হসপিটাল স্টাফ কোয়াটার্স/বাবুরবাগ; ফুচু, বুচু, বু ও কচন/বড় বেলুন; রোজি, রিনি, মাধুর/ বেনাচিতি, দুর্গাপুর–১৩; রঞ্জন, কস্তুরী, পাঁপড়ি ও সুশোভন/চিত্তরঞ্জন; মা, চন্দন, রঞ্জন, শিখা, শুভ্রা এবং বাবা/নর্থ রোড, বার্ণপুর; অর্পণকুমার সেন/আর.ই.কলেজ, দুর্গাপুর–৯; বাবা-মা, দিদিমা, বুদন, সোমেন, উদয় ও টুনা পালিত, স্বপন দে/ঘটকপাড়া, কালনা; মা, বাদশা, ঝুম ও রুমি/নূতনহাট, আসানসোল; সুশান্ত দে/চিত্তরঞ্জন; অমিত ও পম্পি মুখার্জী/সেনর‍্যালে; দেবদত্তা, সমীর ও শ্যামলী বসু/ডি.পি.এল. কলোনী, দুর্গাপুর–২; সোমা, বন্দনা এবং সুকুমার ঘোষ/মহিস্কাপুর রোড, দুর্গাপুর–৫; দীপঙ্কর, মিলন ঘোষ, সজিৎ ঘোষাল, সুধীর মাল, ওড়াং আব্বাস আলি/পাথরঘাটা, বহরকুলি; বিমল, সোমনাথ, সন্তোষ ও তপন মণ্ডল/ইণ্ডিয়ান ওভারসীজ ব্যাঙ্ক, রাণীগঞ্জ; সুকান্ত, জয়ন্ত ও তাপসী মল্লিক/এ.নি.এল. টাউনশিপ, দুর্গাপুর–৬; রাজু ও জনা/কালনা; দেবীপ্রসাদ, মন্দিরা, ইন্দিরা, বাবা ও মা/সুকান্ত পল্লী, আসানসোল–২; মায়া, ব্রততী এবং শান্তনু/কোয়া নং.ডি.এন–১৪০; কোক ওভেন কলোনী; দুর্গাপুর–২; বাপী, গোরা, বাপ্পা, মিণ্টু, সৌম্য আর মনীষ/বীরহাটা, কালীতলা; শিবপ্রসাদ রায় চৌধুরী/বীরুডিহা; বুলু, বোঁচা, দাদা, বাবা ও মা/সাগরভাঙা কলোনী, দুর্গাপুর; শুভজিৎ ও মহাশ্বেতা বন্দ্যোপাধ্যায়/ভি.কে নগর, দুর্গাপুর–১০; তপোব্রত, বাবুয়ান, রাজর্ষি, সুস্মিতা ও ঊর্মিব্রত/অফিসারস কলোনী, হিন্দুস্থান কেবলস; রিংকি, বাবলু, বাবিন মাসি ও ঠাকুমা/এ.বি.এল.টাউনশীপ; দুর্গাপুর–৬; সোনাই ও বুটুল/কোক ওভেন কলোনী, ডি.এন, দুর্গাপুর–২; বাবা, কাকা, দাদা, বোন ও আমি/বনপাস কামাড়পাড়া বাজার; অসিত, অমিত, মা ও বাবা/দুর্গাপুর–৪; প্রিয়ব্রত, সুব্রত ও সত্যব্রত/মাস্টারপাড়া, কাটোয়া; বুম্বা, সন্টু, পল্টু, বীণা, বৌদি, দাদা, মা ও বাবা/রাণীগঞ্জ, শিশুবাগান কলোনী; সাধনা, অপর্ণা, সিধু, অঞ্জু, টুকু ও মিঠু/শিবাজী রোড, দুর্গাপুর–৪; অপূর্ব, কাজল, অমিত, ডোম্বল ও বুম্বা/ভি.কে.নগর, দুর্গাপুর–১০; অজন্তা, অরুণা, অসীম, বাপিন, তাতাই, ভনা, ধীরেন, শিবানী, অতনু, শান্তনু, বাপ্পা, টাপু ও বুড়ো/গুসকরা; কাকলি ঘোষ/জয়দেব এভিন্যু, 'বি' জোন, দুর্গাপুর–৫; মুনমুন, রীণা, ঝুমা, মা ও বাবা/নাইন্স রেস্কু, সীতা রামপুর; সমরেশ, ধনঞ্জয়, প্রভাকর/দুর্গাপুর–৬; ডাঃ বাবু, রাঙামণি, মুন্নাদা ও পম্পি/কুলটি হাসপাতাল; বাবা-মা, মীনাক্ষী, প্রিয়াংকা, ধ্রুবজ্যোতি ও তপনজ্যোতি ভৌমিক/ফাল্গা সেণ্ট্রাল হসপিটাল, আসানসোল; সোমনাথ চক্রবর্তী/বর্ধমান কম্পাউণ্ড;

।। মেদিনীপুর ।।

কৌশিক মাইতি ও বাপু/মহিষাদল; দেবী, চিনু, কাকা, কাকীমা, চন্দন, শুক্লা, স্বপ্না, তমাল, অলোক, প্রদীপ/কাদড়া, নিয়োগীপাড়া; ফাল্গুনী, সুব্রত ও বুন্টা/খার্লশিউলি; ঋত্বিক মজুমদার, শ্রীতমা মজুমদার, পরমা মজুমদার/শিলদা; ধীরেন্দ্র পণ্ডিত, সুন্দর জানা, শ্যাম ব্যানার্জী/বাড়াগড় প্রাথমিক বিদ্যালয়; বাপী, শাশ্বতী, ছোটোং, কাঞ্চন পাণ্ডে/আকছড়া; মা, বাবা, রীতা, নন্দিতা ও শুভ্রা বসু/নিউ ডেভেলপমেণ্ট রেল কলোনী, খড়গপুর; শ্রীলেখা, মানিক, সুপ্তি ও স্বর্ণেন্দু/গড়বেতা; টুম্পা, ভোম্বল, পুটুরাণী, রিঙ্কু, মিতু, সণ্টু ও ছোট্‌কা/বাজকুল; মৌসুমী, রমা, সোমা/বারপাথর;

।। নদীয়া ।।

তপন ও শিপ্রা চৌধুরী/চাকদহ, কাঁঠালপুলি; দেবশ্রী ব্যানার্জী/শচীন সেন রোড, কৃষ্ণনগর; রাজা, হিরো, সোনা, রূপা, টুম্পা, সুপ্রিয়া ও সন্তোষ সাহা/রায়পাড়া, কৃষ্ণনগর; রূপক, হীরক ও মিতা বিশ্বাস/চন্দনদহ; টুটুল, কাজল, অলোক, মিঠু ও অশোক সাহা/বগুলা কলেজ রোড; শুভশ্রী ও শুভ্রাংশু ঘোষ/বি-২/৬৩ কল্যাণী; খোকা, মনা, বুলু, তুকু, ঊর্মিলা, স্বাতী, পিকলু ও দেবস্মিতা/কদমতলা, কৃষ্ণনগর; তপন, তরুণ ও শান্তিকুমার ঘোষ/চন্দনদহ ভায়া বাদকুল্লা; জয়শ্রী, রীতা, দীপংকর; তপন ও মা-বাবা/চাকদহ, রঞ্জনপল্লী; ব্রহ্মপাড়া শিশু সংঘ/ বাদুড়িয়া, শিমুরালি; শিল্পী, শিপ্রা ও নিশীথ দে/ষষ্ঠীতলা, নবদ্বীপ; বাবুই, টুম্পাদি, উজ্জ্বল ও বাবা-মা/বি ২/২৩৭ কল্যাণী/ডেভিড, শ্যামলী ও যোসেফ মণ্ডল/বেলেডাঙা, কৃষ্ণনগর; ডোনা, জুলু, রাজাসাহেব ও সুদীপ্ত প্রামাণিক/আশানন্দ পাড়া স্ট্রীট, শান্তিপুর;

।। বাঁকুড়া ।।

বেবি, আশা, হেলু, ময়না পিসি ও ছোট মাসী/উখড়াডিহি; মিল্টন, কল্লোল, মৌসুমী, সমাপ্তি, অষ্টমী ও হাসি/নোহর; রণসুদাস জিতু ও শরকৃষ্ণ চট্টসূর্য/বিষ্ণুপুর, যাদবগোপাল রোড; রমা, প্রসূন, পীযূষ, প্রণব, মিতা ও হিরন্ময় কর্মকার/প্রতাপপুর, বড়জোড়া; অমিয়, তম, জগন্নাথকা, স্বপন, অশোকদা ও বাণীপ্রসাদ/উখড়াডিহি; সনৎ, শ্রীকুমার, সুদীপা, মহুয়া ও বগলানন্দন ব্যানার্জী/গ্রাম+পো: গুন্নাহ; স্বপন, অর্চনা ও অনিন্দিতা সেনগুপ্ত/মলিয়ান; অমিয়, প্রতিভা ও প্রণব দত্ত/গোপালগঞ্জ, বিষ্ণুপুর; নির্মলেন্দু, উজ্জ্বল, রীণা ও শিখা মাজী/গঙ্গাজলঘাটী; মিতু ও সমীর সুরাল/সুরমানগর, রামনগর; বাবু, বিল্টু, মিঠু, মৌ, পিউ, রিয়া, বাবা ও মা/প্রতাপবাগান; অনন্ত, শুভ্রা, রাজ্যশ্রী, অরূপ, রাণা ও সুনীল মিত্র/গঙ্গাজলঘাটী; সুর্মা, শম্পা ও মৃণাল/সিনেমা রোড;

।। পুরুলিয়া ।।

শিউলি, স্বপন, প্রণব, কাকা ও কাকীমা/সান্তালডি; রাখি, মুন্নি, টুকু, অনুপ, শঙ্খদীপ, কুশল, চিত্ত, অঞ্জলি ও সুলেখা/সাঁন্তালডি; টুম্পা, পুচকু, পাপাই, গোগোল ও মোহিতমামা/স্টেশন রোড; তোতন, বুবাই, বাবলু, স্বপন, লাল্টু, মিঠু ও

নবকুমার/মানবাজার; অনু, মিতু, বাবি/সান্তালডি; মিতা, রুণু, রুমকি, ঝুমকি, শান্তনু ও টুনটুন/আদ্‌রা; চিরন্তন, উত্তরণ, নন্দিতা ও শুভ্রা মাসী/নড়িহা; বিজয়া, বাপী, লিপি, টিঙ্কু, শ্রীদেবী, মুন্নি ও চন্দানি/মধুপুর, মানবাজার;

।। বীরভূম ।।

অনির্বাণ, অনিরুদ্ধ, অনিন্দিতা, অনিতা ও নিবেদিতা/রামপুরহাট; মীনাক্ষি, চন্দনা, দেবীপদ/বোলপুর, ধর্মরাজতলা; লালমোহন সাহা/চকাইপুর, কুসুমবা, রামপুরহাট; চঞ্চলকুমার মন্ডল/কুসমাসোল; মানিক সাহা, নীরেন ও সোনালি বোস/সাঁইথিয়া, কামারপাড়া; বোধিসত্ত্ব, সৌম্যসত্ত্ব, প্রজ্ঞাসত্ত্ব ও শুদ্ধসত্ত্ব মন্ডল/কলেজ রোড, সাঁইথিয়া;

।। মুর্শিদাবাদ ।।

পর্ণলেখা, লোপামুদ্রা মল্লিক/রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রোড, লালদীঘি, বহরমপুর; জয়ন্ত, রেখা, রবি ও সীমা বৈদ্য/ডোমকল; মুক্তি, ইতি, রমেন্দ্রনাথ, ববি, খুকু, প্রীতিকুমার, টিংকু, মিঠু, চৈতালী, সুব্রত, সুরঞ্জনা, সুনীলদা ও আইনুল হক/ আখেরাগঞ্জ;

।। উত্তরবঙ্গ ।।

বুম্বা, পম্পা ও কেতকী মুখার্জী/লাটাগুড়ি, জলপাইগুড়ি; সব্যসাচী, পার্থ ও শিল্পী চৌধুরী/শিলিগুড়ি, দার্জিলিং; মানসীদি, পুটু, বড়মা, ছোটমা ও অচিন্ত্যদা/নয়াবস্তী, জলপাইগুড়ি; রঞ্জন, ছবি, পুতুল ও রীণা দাস/পুড়াটুলী, রাজেন্দ্রবাবু লেন, মালদহ; সঞ্চিতা, গৈরিক ও জ্যোৎস্না রায়/কার্সিয়াং, দার্জিলিং; সোম সাহেব, অজয় ও পরিমল/মিলন পল্লী হাউজিং এস্টেট, শিলিগুড়ি; রাম, বেবী, পম্পা ও ঝিংকা/সিংহাতলা, মালদহ; তুষার, অঞ্জনা, টোটন/বালুরঘাট হাসপাতাল কোয়াটার্স, পশ্চিম দিনাজপুর; মুন, বাবুয়া, শিবুদা, রাজা, বাবলু ও মিনুদি/কালাচিনি চা বাগান, জলপাইগুড়ি;

।। আসাম ।।

শ্যামল, শ্রাবণী, গীতা, রীতম্ ও উদয় ভট্টাচার্য/লামডিং; শ্রীশুভজিৎ, রূপবর্ণা, মুনমুন, চিত্রাঙ্গদা/একান্স কলোনী, পান্তু, গৌহাটি–১২; প্রসূর্য ও প্রতীম চন্দ/বিবেকানন্দ কেন্দ্র, তিনসুকিয়া; ডালিয়া, ডেইজী, ডুয়েট/ডাকবংলো রোড, শিলচর; নবজ্যোতি, মার্মণি, বাবুজী ও দিদিভাই/ওদালবাক্রা, গৌহাটী; অশোক, তিমির, স্বপন, গুরুপ্রসাদ, জয়ন্তী, শর্মা, পরেশ, মোহন ও ভগবান/ইস্টার্ন সলভেন্সা প্রাঃ লিঃ, কাহিনীপারা, গৌহাটী–১৮; বড়ু, বাবলু, সুমন, মিতু, শম্মি ও ফুলটুসি/হেংগাবাড়ি, গৌহাটী–৬; প্রণব, প্রভাশিস, মনোতোষ ও জয়ন্ত/কাছাড়, বুবুন, বাপী, [illegible] ও বাবা/ডিব্রুগড়; মলয় চন্দ/চন্দভিলা, মিশনপাড়া, ডিগবয়;

।। উড়িষ্যা ।।

জবা, মালা, দোলা ও রাণা/যাজপুর; বিমল, নীহারকণা, মঞ্জু, আলো, শীলা, রাণু, মনাকাকু ও দীপক/দীপক মেডিকেল স্টোর, বোনাইগড়; পাপ্পু, দিদি, দাদামণি, বাবা ও [illegible]/রাউরকেল্লা–৩; মনোজিৎ, সুধা ও গোপা ভট্টাচার্য/ইউনিট–৪, ভুবনেশ্বর; শংকর রায়, সীমা দে ও সোমেন দে/রাউরকেল্লা; আবীর, বীণা, ঝংকার, স্বপন ও প্রদীপ/বারবাটি, বালেশ্বর; সমীর সুরাল/বোকারো ইস্পাত নগরী; নন্দন, রাণী, তুফান, তুষার, টিয়া, নন্দিতা, পটকা, রুম্পা, সুবু, বুড়ু, গুড্ডা, কল্যাণী ও গুড়িয়া/ব্রজরাজনগর;

।। বিহার ।।

রীণা, প্রত্যুষ ও তালা ঘোষ/টেলকো, জামসেদপুর–৪; জয়, পাপুন, রুমা, বীণা, রাজু, বিজু, দীপু, মিজু, নিপু ও রমা/বিষ্টুপুর, জামসেদপুর–১; সুবোধ, সন্ধ্যা, সুমিত ও স্বরূপ দত্ত/বটটাঁড়, ধানবাদ; আদিত্য, বেলা, মৌমিতা, সৌরভ দে/থারপাখনা, রাঁচী/ সবিতা, নন্দিতা/জামসেদপুর–১; সুস্মিতা, চৈতালী, সুমিত্রা ও সিদ্ধার্থ/গান্ধী রোড, ধানবাদ; শুভেন্দু, অভিজিৎ ও মৌসুমী নাথ/চক্রধরপুর; স্বরূপ, সুব্রতা, সুলেখা ও স্বস্তিকা/সি.এফ.আর. আই. কলোনী/ধানবাদ; বুম্‌বা ও পিংকি/সিন্ধ্রি; চুমকি, ডামিল, নবনীতা ও মা/নিউ কলোনী, ধানবাদ; বাবু, নারু, ঝন্টু ও ফকির জামাইবাবু/ধানবাদ; বাপ্টি, শিন্টু, বাবুয়া, শিবানী, ঝুমা ও আইভী/আমলাপাড়া, ঝরিয়া; কেয়া, কেকা, বাবু, বুবুলি ও ঝুপু/রাঙামাটি, সিন্ধ্রি; সহদেব হাজরা/কুমার-ডুবি, ধানবাদ; মমতা, বনানী, দীপংকর ও দীপান্বিতা সেন/মনোহরটাঁড়, সিন্ধ্রি; মৌসুমী ও গৌতমী বসু রায়/সিন্দ্রী; মহুয়া ও ডালিয়া ব্যানার্জী/কাঁথারা, গিরিডি; অরূপ, অনুপ, কাঞ্চন, মৌসুমী, মলয়, চন্দন, অলক/লাদনা, ধানবাদ; স্বপন চক্রবর্তী/চাকুলিয়া, সিংভূম; পিঙ্কু ও পাপু/কাটিহার; ইন্দ্রাণী ও নন্দিনী চৌধুরী/জামসেদপুর, টেলকো।

*** শ্রাবণ সংখ্যার শব্দমালার উত্তর:**

পাশাপাশি:

১। শিমুল ৩। ঘায়েল ৫। হরদম ৮। লব ১০। ক্ষার ১১। রব ১২। দম ১৪। জাপান ১৫। মালতি ১৮। ক্ষেত ১৯। তাস ২০। লখা ২১। শুকতারা ২৫। ললনা ২৬। তার্পিন

ওপর-নিচ:

১। শিকল ২। লহ ৩। যাম ৪। লবাব ৬। রক্ষা ৭। দরজা ৯। বদমাস ১১। রণক্ষেত্র ১৩। মল ১৫। পাত ১৭। তিলক ১৯। তাতাল ২১। খাতা ২২। স্তালিন ২৩। শূনা ২৪। রাতা

সমরেন্দ্রনাথ দে কলকাতা–৭০০০৬৩

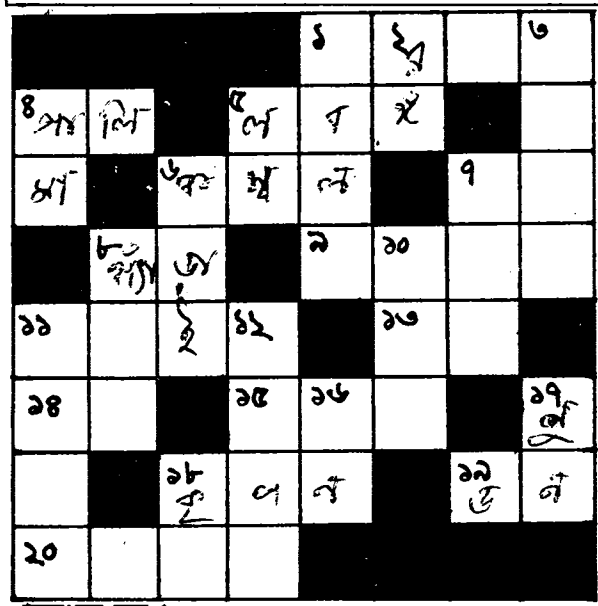

সমাধান সূত্র:

পাশাপাশি:

[১] কৃষ্ণনগরের বিখ্যাত খাবার [৪] ক্রিকেটের ভাষা, বাংলায় মন্দ কথা [৫] দামী মসলা [৬] শীতকালে ওটা চাই [৭] কাকা— [৮] যার উচ্চতা কম [৯] মাতব্বর [১১] নিমন্ত্রণ [১৩] দুই ঘোড়া টানা গাড়ি [১৪] খেলার বস্তু [১৫] কৌতুক [১৮] খরচ করতে যে চায় না [১৯] স্বাস্থ্য মানলে ওটা রোজ করতে হয় [২০] ফল বিশেষ

উপর-নিচ:

[১] শক্তিমানের আছে [২] তামাসা [৩] পশু [৪] নামকরা পালোয়ান [৫] জ্যামিতিতে আঁকতে হয় [৬] রান্নার পাত্র [৭] বাজি [৮] নিচু [১০] পুচ্ছ [১১] ময়লা [১২] রাজা [১৬] লোক [১৭] রান্নায় ওটা লাগবেই

[উত্তর আগামী সংখ্যায়]

দাদুমণির চিঠি

শুকতারাব বন্ধুরা,

ভালো আছো তো সব। পুজো আবার এসে গেলো। ঠাকুর গড়া হচ্ছে। বাজার টাজার করা আরম্ভ হলো বলে! আকাশে জলভরা মেঘের পাশ দিয়ে উঁকি দিচ্ছে শরতের নীল আকাশ। কাশবনে ফুল ফুটি ফুটি করছে। এখন তো শুধু মজা। পুজোর বাদ্যি বাজার অপেক্ষা। এবার তোমাদের জন্যে মস্ত বড় একটা বিস্ময় অপেক্ষা করে আছে। কী? তা বলবো না। আর কিছুদিন পরেই হাতে পাবে। তারপর কিন্তু জানাবে কেমন লেগেছে তোমাদের।

আজ তোমাদের একটা ছোট্ট গল্প বলি। কার্তিক আর গণেশ দুই ভাই। মা দুর্গার কাছেই তাঁরা থাকেন। মায়ের গলায় দুলছে একটি রত্নহার। তাতে আলো পড়ে ঠিকরে বেরুচ্ছে। ঝকমক করছে চারদিক। দুই ভাই মায়ের গলার মালাটার দিকে তাকান আর ভাবেন–ঐ রকম একটা মালা তাঁদেরও চাই।

মা দুর্গা জানতেন দুই ছেলের মনের কথা। একদিন দুই ছেলেকে ডেকে বললেন, তোমাদের মধ্যে যে আগে এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে আসতে পারবে তাকে এই মালাটা দেবো।

কার্তিক সঙ্গে সঙ্গে ময়ূরে চেপে বেরিয়ে পড়লেন। ভাবলেন, গণেশ দাদার বাহন ইঁদুর। গণেশ দাদা কিছুতেই তাঁর আগে ঘুরে আসতে পারবেন না। তাই খুশি মনে কার্তিক উড়ে চললেন।

ওদিকে কার্তিক চলে যাবার পর গণেশ ধীরে সুস্থে উঠলেন। গণেশ মাকে বড় ভালোবাসেন। মায়ের চেয়ে বড় তাঁর কাছে আর কিছুই নয়। তিনি ভাবলেন, মাই তো আমার বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড।

তাই মার চারপাশ ঘুরে এসে মাকে প্রণাম করে তাঁর সামনে বসে পড়লেন।

দেবী ভগবতীর মুখে হাসি খেলে গেলো। হাসিমুখে তিনি গণেশের গলায় পরিয়ে দিলেন সেই রত্নহার।

ওদিকে অনেকদিন পরে ক্লান্ত কার্তিক বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড ঘুরে ফিরে এলেন। দেখলেন, গণেশদাদার গলায় মায়ের সেই রত্নহার।

কার্তিক বুঝতে পারলেন সব। খুশিও হলেন। মা দুর্গা আর দাদা গণেশকে প্রণাম করে তিনিও বসে পড়লেন তাঁদের সামনে।

বুঝলে তো মা-বাবার থেকে বড় কেউ না। পুজো আসছে। মা দুর্গা ছেলে মেয়েদের নিয়ে আসছেন। এবার ঠাকুর দেখতে গিয়ে নিশ্চয়ই গণেশ দাদা, কার্তিক আর মা দুর্গার রত্নহারের গল্পটা মনে পড়বে।

এখন তো শুধু মজা। বিশ্বকর্মা পুজো আসছে। ঘুড়ি উড়োতে হবে। সুতোয় মাঞ্জা দিতে হবে। কতো কাজ। তার ওপর আবার খেলা টেলা আছে। তবে যাই বলো বাতাসে যখন শিউলি ফুলের গন্ধ ভাসে, নীল আকাশে কাশফুলের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের আনাগোনা তখন আর কিছু ভালো লাগে না। মনে আসে শুধু পুজোর কথা। আগে তো এক মাস আগে ঘট বসে যেতো। দুপুর আর সন্ধ্যেবেলার ঘট পুজো একটি একটি করে দুর্গা পুজোর দিন যেন এগিয়ে আনতো। তারপর একদিন ভোর-বেলায় ঢাকের শব্দে ভেঙে যেতো ঘুম। ড্যাং ড্যাং ড্যা-ড্যাং ড্যাং করে বাজতো–যেন সারা পৃথিবীকে জানিয়ে দিতো পুজো এসে গেছে। আজ বোধন।

ভাদ্র মাস এসে গেছে। আসছে পুজো। তোমরাও তৈরি হয়ে নাও। আর একটা কথা বলি 'দুর্গা' বানানটা দেখেছো তো? অনেকেই 'দূ' লেখে। তোমরা কিন্তু কখনো লিখো না। লিখলেই কেউ হয়তো বলে বসবেন, দাদুমণির চিঠি পড়েও দুর্গা বানান ভুল লিখছো। তাহলে কি লজ্জায় পড়বো বলো তো!

ওদিকে তোমাদের ছোট্ট বন্ধু কৌশিক পাল এক কান্ড করে বসেছে। বৈশাখ সংখ্যায় তার লেখা 'কাঠবিড়ালী' কবিতাটা তোমরা হয়তো পড়েছো। কিন্তু কবিতাটি ওর নিজের লেখা নয়। বছর কয়েক আগে একটি পত্রিকায় মৈত্রেয়ী চৌধুরী ঐ কবিতাটি লিখেছিলেন। কৌশিক হুবুহু সেইটাই পাঠিয়েছে।কী লজ্জার ব্যাপার বলো তো! আগেও এমন কান্ড ঘটেছে! বার বার এমন হলে তো মুশকিল। তখন আমাদের অন্য কথা ভাবতে হবে। তোমরা কিন্তু কেউ কৌশিকের মতো অপরের লেখা নিজের বলে চালিও না। কেমন! এ বড় অন্যায় কাজ। ভীষণ লজ্জার।

আজ এই পর্যন্তই। ভালো থেকো সব।

–দাদুমণি

তোমাদের পাতা

বিশ্বজয়ী

এগারো ভারতীয়ের বাহিনী,
শুনবে তাদের কাহিনী ?
বিশ্বকাপ এনে ভরায় মন,
তারপরেতে হেজেস বেনসন।
এশীয় কাপ এবং রথম্যান,
রবি মোদের নতুন সুপারম্যান।
বাঘা বাঘা যতেক ছিল,
সবে হেরে বিদায় নিল।
যেমন বোলিং, তেমনি ব্যাটিং,
দেয় যে তারা চোস্ত ফিল্ডিং।
মোদের টিম বিশ্ব-সেরা,
হিপ্ হিপ্ হুররে–বলি মোরা।

হরপ্রসাদ চ্যাটার্জী
বয়স নয়, পঞ্চম শ্রেণী
উখড়াডিহী উচ্চ বুনিয়াদী স্কুল
ঝরিয়া, ধানবাদ

রুবি সামন্ত বয়স ছয়, দ্বিতীয় শ্রেণী
রোল্ল বাড স্কুল পাটনা

আমরা দু'ভাই

প্রতিদিন ভোরবেলা আমি আর দাদা,
ব্যায়ামের শেষে খাই ভিজে ছোলা, আদা।

চেয়ে দেখ দেহে তাই মেদ নেই রত্তি,
দেহে মনে দু'জনার হাতি মারা শক্তি।

আমাদের পানে যদি চোখ পড়ে যায়,
অদ্‌ভুত যত ভূত বায়ুবেগে ধায়।

তেড়ে গেলে দু'জনায় যত পাজি গুণ্ডা,
বাংলার মাটি ছেড়ে যায় ভূরকুণ্ডা।

মৌসুমী গুপ্তা
বয়স ষোল, প্রি-ইউনিভার্সিটি
গভর্নমেণ্ট গার্লস কলেজ
চণ্ডীগড়

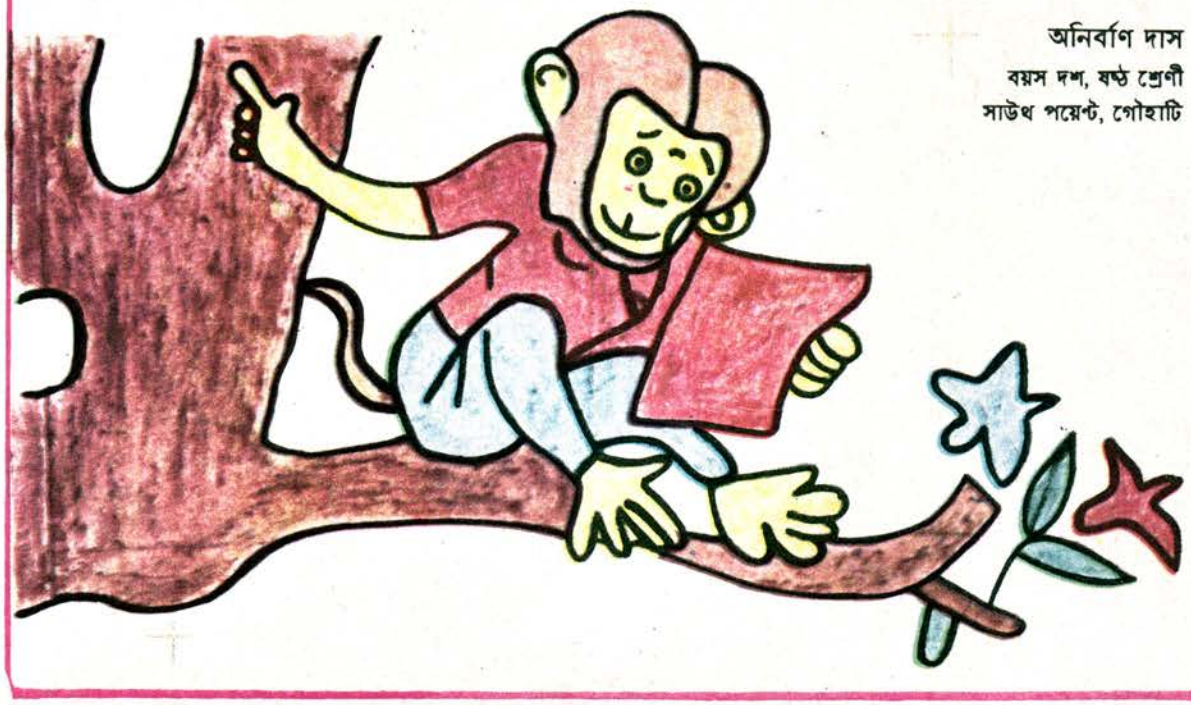

অনির্বাণ দাস
বয়স দশ, ষষ্ঠ শ্রেণী
সাউথ পয়েণ্ট, গৌহাটি

স্বাধীনতা দিবস

মাসটি ছিল আগস্ট আর
দিনটি ছিল পনেরো,
ভারত মাতার বীর সন্তান
একটি তো নয়, হাজারো।
করল তারা ভারত স্বাধীন
গৌরবময় দিনটিতে,
স্বর্ণ আখরে লেখা হয়ে গেল
ইতিহাসেরই পাতাতে।
বীর সন্তান গান্ধী, সুভাষ
আর নির্মল সেন,
বিনয়, বাদল, দীনেশ, কানাই
মাস্টারদা সূর্য সেন।
এঁরা ছাড়াও আছেন অনেক
যাঁদের প্রাণত্যাগে,
অধীনতার আঁধার টুটে
স্বাধীন সূর্য জাগে।
জাতীয় পতাকা ঊর্ধ্বে তুলি
আমরা সবাই,
এসো তাঁদের চরণে আজ
প্রণাম জানাই।

শুভেন্দু মান্না বয়স বারো, সপ্তম শ্রেণী
নিউ আলিপুর বহুমুখী বিদ্যালয় কলিকাতা

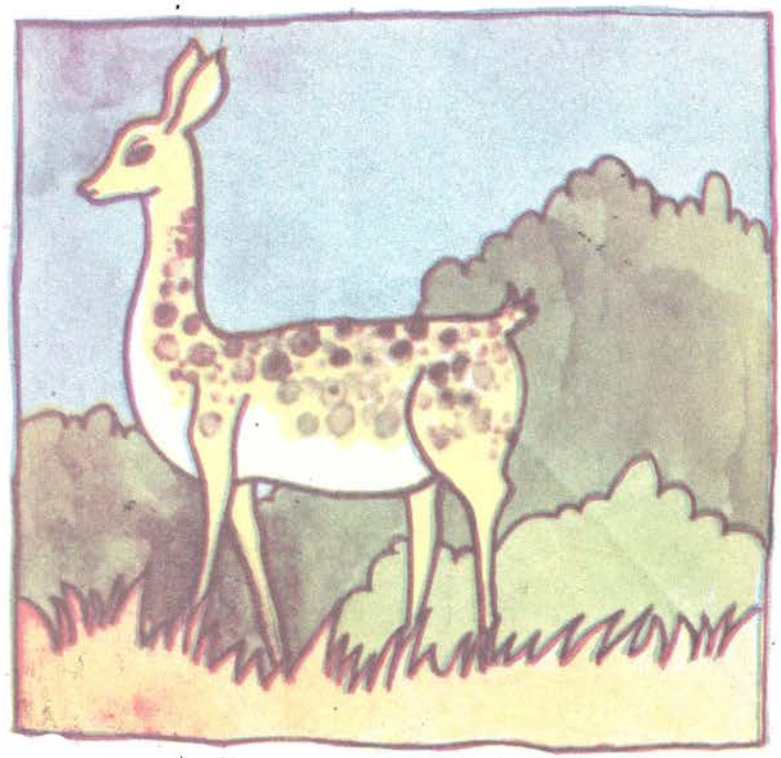

রাজিকা মজুমদার বয়স দশ ৪র্থ শ্রেণী লরেটো ডে স্কুল বহুবাজার

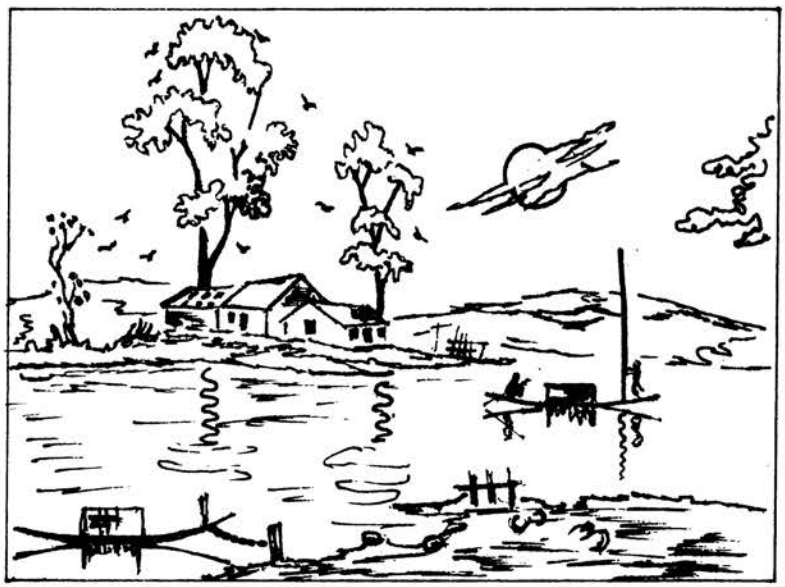

ফারুক আহমেদ বয়স দশ, চতুর্থ শ্রেণী, পাণ্ডুয়া, হুগলী

রুম্পা

রুম্পা নামের মেয়ের মাথায়
একটি গোলাপ ফুল,
নাচে যখন তালে তালে
হয় না যে তার ভুল।

দেখলে তোমার মনে হবে
একটি ফুলের নাচ,
আলো ছড়ায় ছন্দে গানে
সারা ভুবন মাঝ।

রুম্পা বোনের মুখের হাসি
ঝলমল, ঝলমল,
দূর আকাশের চাঁদের মতো
খুশিতে টলমল।

বিশু মিত্র
বয়স বারো
দেশবন্ধুনগর কলিকাতা ৫৯

ধারাবাহিক রহস্য উপন্যাস

স্বপন বন্দ্যোপাধ্যায় (পূর্ব প্রকাশিতের পর)

মানুষ চেনা দায়

এরিক গ্যাঞ্জালেসও এসেছিল। ওর কথাটাই আমাদের কাছে কিছু অন্যরকম মনে হয়েছে। ও বলেছে, পশুপতিবাবুর যে এমন একটা পরিণতি হবে তা নাকি ও আগেই অনুমান করেছিল।

প্রসেনজিৎবাবু স্বভাবতই অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছেন, তোমার অনুমানের কারণ?

লোকটার ইদানীং মতিভ্রম হতে শুরু করেছিল স্যার। খাঁটি হিন্দু বামুনের ঘরের ছেলে। এককালে পুজো-আচ্চাও করতো, কিন্তু কিছুকাল হলো সন্ধ্যাহ্নিক ছেড়ে নেশা করতে শুরু করেছিল।

বল কী! এবার আমি চমকে উঠে বলি, ভদ্রলোককে দেখে তো তা মনে হতো না।

বাইরে থেকে দেখে সবাইকে কি সব কিছু মনে হয় অর্ণববাবু। গ্যাঞ্জালেস বেশ রসিয়েই বলছে মনে হলো। পশুপতি ভট্টাচার্যকেও বাইরে থেকে কিছু বোঝা যেত না। এক একদিন তো আমার কাছে গিয়ে হাজির হতো। হাতে নোটের তোড়া। বলতো, এরিক, তোমার সেরা মুর্গীটা কেটে দাও। আজ একটু মৌজ করে খাওয়া-দাওয়া করবো।

বিড়বিড় করলেন প্রসেনজিৎবাবু, আশ্চর্য। এসব কথা তো আগে কেউই আমায় বলেনি। তবে ইদানীং অবশ্য পশুপতিবাবুর শহরে যাবার মাত্রাটা একটু বেশি বেড়েছিল। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, শহরে যাচ্ছি বউ-ছেলের সংগে দেখা করতে।

গ্যাঞ্জালেস বললো, লোকটা অপঘাতে মারা গেছে, এখন অবশ্য এসব কথা তার নামে বলা উচিত নয়, তবু মেঘনাদবাবু গোয়েন্দা লোক, তাই তদন্তের স্বার্থেই বলা।

মেঘনাদ গোয়েন্দা, একথা আপনাকে কে বলেছে? আমি গ্যাঞ্জালেসের দিকে তীব্র দৃষ্টিতে তাকিয়ে বলি। লোকটার হাবভাব আর আমার মোটেই ভাল লাগছে না।

এরিক গ্যাঞ্জালেস একই ভাবে হেসে উঠলো, তারপর বললো, মেঘনাদবাবু এখানে পা দেবার আগেই শুনেছি। পশুপতিবাবুই বলেছেন।

মেঘনাদ এবার প্রসেনজিৎবাবুর দিকে একবার

তাকালো। প্রসেনজিৎবাবু একটু কিন্তু কিন্তু করে বললেন, মানে কথাটা আমিই তাকে বলেছিলাম সাহেব বাংলোর ভূতের ভয় থেকে তাকে আশ্বস্ত করার জন্যে। তখন তো বুঝিনি...

মেঘনাদ কিন্তু প্রসেনজিৎবাবুর পুরো কথাটা না শুনেই এরিক গ্যাঞ্জালেসের দিকে তাকিয়েছে, আচ্ছা, এ এলাকায় চন্দ্রাণী বলে কোনো মেয়ে আছে বলে আপনি জানেন?

চন্দ্রাণী! এরিক একটু সময় ভাবলো, তারপর ঘাড় নেড়ে বললো,উহুঁ। চুনিয়া নামে একজনকে অবশ্য চিনি, তার বয়স কম সে কম ষাট।

ধ্যাৎ! আমি মনে মনে বিরক্ত হই। চুনিয়া আর চন্দ্রাণী এক হলো। লোকটা কি বোকা না বোকার ভান করছে?

এরিক গাঞ্জালেস চলে গেল। তারপর থেকেই প্রসেনজিৎবাবু একটা কথাই বারবার বলছেন, বুঝলি মেঘনাদ, মানুষ চেনা বড় দায়।

মেঘনাদের জবাব শুনলাম, ঠিকই বলেছিস প্রসেনজিৎ কথাটা আমিও ভাবছি। তবে শুধুমাত্র পশুপতি ভট্টাচার্যের সম্পর্কেই নয়।

মেঘনাদের মুখের দিকে চকিতে তাকালাম। ওর সারা মুখটা থমথম করছে।

কি বলতে চায় মেঘনাদ?

ভূতের চিঠি

পরদিন ভোরে ঘুম ভেঙে উঠে দেখি মেঘনাদ ইতিমধ্যেই উঠে পড়েছে। বিছানার ওপর বুকে বালিশ দিয়ে আধশোয়া হয়ে একটা সাদা কাগজে কী যেন আঁকছে. ভাল করে তাকিয়ে বুঝলাম–একটা ম্যাপ।

এ কোথাকার ম্যাপ রে মেঘনাদ? প্রশ্ন করি।

ভাল করে লক্ষ্য করে দেখ না, মেঘনাদ আমার দিকে চোখ না তুলেই বললো, এই হলো সুবর্ণরেখা। এই জঙ্গল, আর এ পাশে এই সাহেব বাংলো।

দেখতে দেখতে হাসি চেপে বললাম, এ তো তাজমহল আঁকতে হাতি এঁকেছিস। কিছুই বোঝার উপায় নেই।

ভেবেছিলাম মেঘনাদ চটে যাবে কিন্তু চটলো না বরং বললো, যার কাজ তারে সাজে, অন্য লোকের লাঠি বাজে, শুনিস নি? ভাবছি ম্যাপটা একবার ইনসপেক্টর পোদ্দারের শ্যালকের কাছে নিয়ে গিয়ে ঠিকঠাক করে নেব। উনি আর্টিস্ট মানুষ এ ম্যাপ ঠিকমতো আঁকতে দেরি হবে না।

আমি বললাম, কিন্তু হঠাৎ ম্যাপের দরকার হলো কেন বুঝতে পারছি না তো?

মেঘনাদ বললো, সেটা বোঝা কি তেমন শক্ত ব্যাপার?

আমি আমতা আমতা করে কিছু বলার আগেই মেঘনাদ কাগজটা গোল করে মুড়তে মুড়তে বললো, তুই বরং এখন বাংলোতেই থাক, আমি তিনকড়ি পোদ্দারের শ্যালক মণিশংকরবাবুর কাছ থেকে ম্যাপটা ঠিক করে এঁকে নিয়ে আসি।

মেঘনাদ ফিরলো ঘণ্টা দুয়েক বাদে, আমি তখন বাংলোর বারান্দায় একটা চেয়ারে বসে এক পুরনো পত্রিকার পাতা ওল্টাচ্ছি।

এই দুঘণ্টা একা থাকলেও এখানকার প্রকৃতির প্রসাদগুণে মোটেই খারাপ লাগছিল না। রান্নার জায়গা

থেকে দিবাকরের বউ তুলসীর কণ্ঠের গুন গুন গানের কলি ভেসে আসছে। গানের কথাগুলি বড় বিচিত্র:

"কাঁসাই নদীর বালি আন্যে জাওয়া পাতিব ল
আমাদের জাওয়া উঠবে রাগে তাল গাছের পারাল।
সবুজ উঠে খিন খিন আমার জাওয়া উঠে না
তুমার ল গি দিব এক উপাস।..."

গানের কথার অর্থ কিছুই বোঝা যায় না। এখানকার আদিবাসী গোষ্ঠীর নিজস্ব ভাষা ও সুর। সেদিন প্রসেনজিৎবাবু বলছিলেন, এখানকার ঝাড়খণ্ডী মানুষদের সব চেয়ে বড় পরব 'টুসু', তারপরই 'জাওয়া' পরব। এটি আসলে শস্যোৎসব। ভাদ্র মাসের পার্শ্ব একাদশীর দিন হয়। সে দিন আসতে বেশি দেরি নেই।

কান পেতে তুলসীর বিচিত্র সুরের গান শুনতে ভালই লাগছিল।

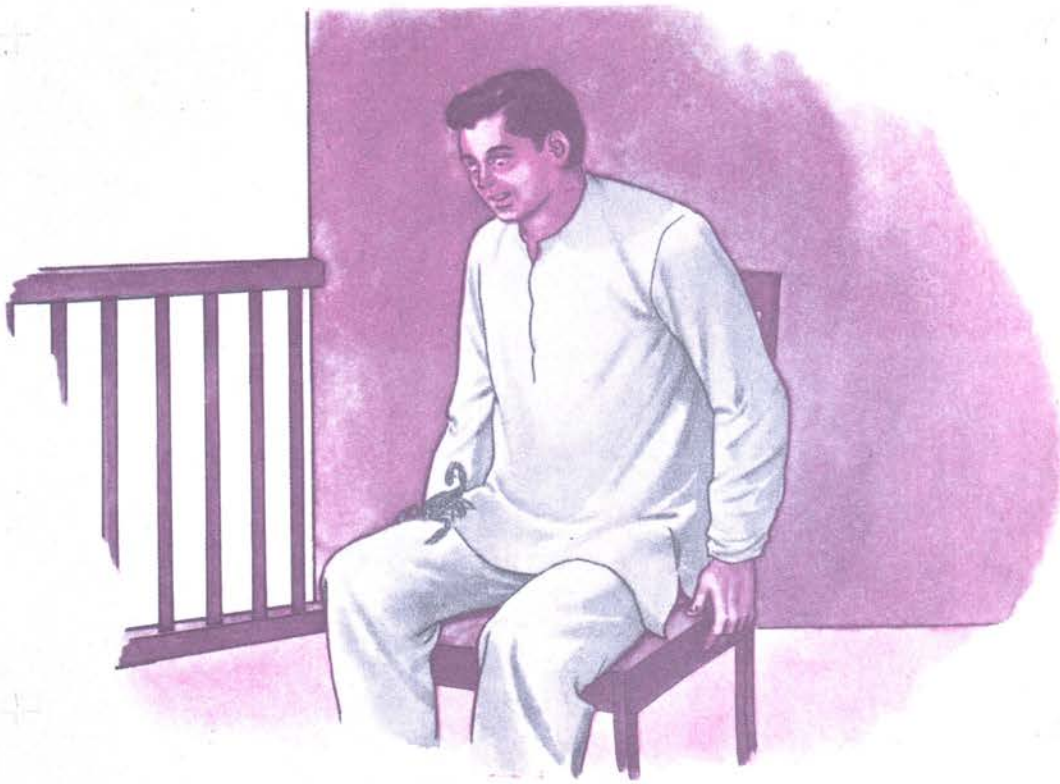

চমকে তাকিয়েই সারা শরীরটা হিম হয়ে গেল।

কিন্তু চমক ভেঙেছে জীপের শব্দে।

মেঘনাদকে সঙ্গে নিয়ে প্রসেনজিৎবাবু ফিরে এসেছেন।

বাংলোর বারান্দায় উঠতে উঠতে মেঘনাদ বললো, মণিশঙ্করবাবু যে সত্যিই কত বড় শিল্পী সে প্রমাণ পেলাম আজ। নিয়মিত চর্চা না থাকলেও কী চটপট ম্যাপটা এঁকে দিলেন। বলতে বলতে একটা বড় কাগজে আঁকা মানচিত্রটা মেলে ধরলো মেঘনাদ।

সত্যিই নিখুঁত! এক পলক দেখলেই আর কিছু বোঝার অসুবিধে থাকে না।

বললাম, ইনসপেক্টর পোদ্দারের সঙ্গে দেখা হয়েছে?

নাঃ। মেঘনাদ বললো, শুনেএলাম পাশের গাঁয়ে কার নাকি গত রাতে গোয়াল থেকে গরু চুরি হয়েছে। সকাল হতেই ছুটেছেন এনকোয়ারি করতে।

সত্যি ভদ্রলোকের জন্যে দুঃখ হয়, অমন শরীর নিয়ে শেষ পর্যন্ত কিনা গরু চোরের পেছনেও ছুটতে হচ্ছে।

প্রসেনজিৎবাবু হেসে বললেন, ঠিক এই কথাটাই জীপে ফেরবার সময় মেঘনাদকে বলছিলাম।

দুপুরে খাওয়ার টেবিলে বসে মেঘনাদ বললো, বিকেলে আমায় একটু বেরুতে হচ্ছে। মনে হচ্ছে আজ নাও ফিরতে পারি।

বাইরে বলতে কোথায় যাবি? জিগ্যেস করি।

প্রথমে খড়গপুর তারপর কলকাতায়। আশা করছি আগামীকাল সন্ধ্যের মধ্যেই ফিরবো।

একা যাবি?

হ্যাঁ। মেঘনাদ খাওয়া শেষ করে উঠতে উঠতে বললো, তুই বরং আজকালের মধ্যে গতকাল রাতের চিঠির সেই 'চন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়ি যাওয়ার' অর্থটা উদ্ধার করতে পারিস কিনা ভাব।

আমি বললাম, ওটা নিয়ে আর নতুন করে ভাবার কি কিছু আছে?

আছে বন্ধু, মনে রেখ সাহেব বাংলোর ভূত রহস্যের ওটাই মূল চাবিকাঠি।

তুই কি কিছু অনুমান করছিস? প্রসেনজিৎবাবু প্রশ্নটা করলেন।

মেঘনাদ বললো, আমি অনুমান করি না, অঙ্ক করি। সিঁড়ি ভাঙা অঙ্কের মতো রহস্যেরও সমাধান হয়। আমি

থানা থেকে আসার সময় একটা সীল করা খামে কিছু নির্দেশ ইনসপেক্টর পোদ্দারের জন্যে রেখে এসেছি। এখান থেকে আমি না বলা পর্যন্ত বিশেষ কয়েকজন ব্যক্তি মৌবনির বাইরে যেন না যায় বলেছি, সে ব্যাপারটাতেও যেন তিনি নজর রাখেন।

সেই ব্যক্তিদের মধ্যে আমিও আছি নাকি? হাসতে হাসতেই জিগ্যেস করলেন প্রসেনজিৎবাবু।

মেঘনাদ কি একটা বলতে যাচ্ছিল কিন্তু বলা হলো না, তার আগেই উত্তরের খোলা জানলাটা দিয়ে ডাইনিং রুমের টেবিলের ওপর খট্ করে কি একটা এসে পড়লো–

ঢিলের সঙ্গে সুতোয় বাঁধা একটা চিরকুট।

নিশ্চয়ই উত্তরের ওই জংলা বাগানটা থেকে কেউ ছুঁড়ে ফেলেছে।

মেঘনাদ ততক্ষণে চিরকুটটা হাতে তুলে নিয়েছে। ওটা একটা চিঠি। কোনো সম্বোধন নেই। পত্রদাতার নামও নেই। কয়েকটা কথা শুধু ইংরেজীতে লেখা আছে। বাংলা অনুবাদ করলে দাঁড়ায়ঃ

"আগুনে না জেনে হাত দিলে অবুঝ শিশুও রেহাই পায় না। শুধু এটুকু মনে করিয়ে দিলাম।"

ব্যাপারটা আকস্মিক। আমরা সবাই কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ। ডেনিস সাহেবের ভূত অনেক খেলাই জানে– চিরকুটটা পকেটে ভরতে ভরতে মেঘনাদ বললো, একটা ছোট কাগজ আর পেন-টেন যা হোক কিছু দে তো।

কী করবি?

আঃ দে না–

প্রসেনজিৎ মজুমদার পাশের ঘর থেকে এক টুকরো কাগজ আর একটা ডট পেন এনে দিলেন।

মেঘনাদ সেই ছোট কাগজটার ওপর লিখলোঃ

"দিন দুপুরে ভূতের ঢিল
ছুটে এল কী মুশকিল!
সেই সঙ্গে উপদেশ
ভূতগিরিটা জমছে বেশ,
আগুন শিখা লেলিহান
পোড়ায় তাতে কে কার জান!"

ছড়াটা লিখে কাগজের টুকরোটা সেই একই ঢিলে বেঁধে উত্তরের জানলাটা দিয়েই আবার ছুঁড়ে দিল মেঘনাদ। তারপর বললো, আশা করি শ্রীমান ভূত মহোদয়ের হাতে তাঁর চিঠির জবাব ঠিকই পৌঁছে যাবে, কী বল?

আমি বলবো কি, আমি তো রীতিমতো ভ্যাবাচাকা খেয়ে গেছি। প্রসেনজিৎবাবুও তথৈবচ।

শুধু মেঘনাদের দুচোখে কৌতুক।

মৃত্যুদূতের কবলে

সেইদিনই দুপুর দুটোর বাসে মেঘনাদ খড়গপুর চলে গেল।

তারপর থেকে সাহেব বাংলোতে আমি একা।

প্রসেনজিৎবাবু সাইট ইনসপেকশনে বেরিয়েছেন। কদিন যাবৎ দক্ষিণের জঙ্গল এলাকায় নতুন বন সৃষ্টির কাজ চলছে। নতুন নতুন চারা রোপণ থেকে শুরু করে সেগুলোর রক্ষণাবেক্ষণের সব ব্যবস্থারই দায়িত্ব ফরেস্টরেঞ্জার প্রসেনজিৎ মজুমদারের।

বাংলোর বারান্দায় একটা চেয়ার টেনে নিয়ে চুপচাপ বসেছিলাম।

সমস্ত বাংলোটা যেন খাঁ খাঁ করছে।

পশুপতিবাবুর মৃত্যুর পর থেকে বাংলোর অফিস-ঘরের তালা আর খোলা হয় নি। ওয়াচম্যান দিবাকরও যেন ভয় পেয়েছে মনে হয়। তারপর থেকে আর এদিকে ঘেঁষে নি। অবশ্য এটা অস্বাভাবিক নয়।

তাকিয়েছিলাম বাংলোর অনতিদূরে ওই শাল-পিয়াল-মহুয়ার জঙ্গলের দিকে।

এখন সব কিছুই স্বাভাবিক। নীল আকাশের নিচে সবুজ-শ্যামল বনানী কেমন যেন পরস্পরের হাত ধরাধরি করে দাঁড়িয়ে আছে। মৃদুমন্দ হাওয়ায় কাঁপছে গাছের পাতা। মাঝে মাঝে উড়ে যাচ্ছে পাখির ঝাঁক। কোথায় একটা ঘুঘু ডেকে চলেছে অনেকক্ষণ যাবৎ।

কিন্তু আমি তো জানি ওই সুন্দর প্রকৃতির রূপ-রসের ভেতরে আছে অন্য রূপ–যার কিছু পরিচয় গত কয়েকদিনেই পাওয়া গেছে।

সে রূপ বড় নিষ্ঠুর, বিভীষিকাময়!

এই বাংলো বাড়ির চারপাশে নাকি ঘুরে বেড়ায় দেড়শো বছর পূর্বে নিহত এক নীল সাহেবের অতৃপ্ত আত্মা– শতাব্দীর জিঘাংসা বুকে নিয়ে।

পরপর দুটো মৃত্যু এই জঙ্গলের মধ্যে প্রায় চোখের ওপরই ঘটে গেল আমাদের।

ঘটনাগুলো যতই ভৌতিক বলে সাজাবার চেষ্টা থাকুক, ব্যাপার যে ভৌতিক মোটেই নয় অন্তত সেটা এই কদিনে পরিষ্কার হয়ে গেছে।

সব কিছুর পেছনে আছে এক মারাত্মক দুষ্ট চক্রান্ত সন্দেহ নেই।

তবে এতদিন ভূত-বিভীষিকাই কেল্লামাৎ করছিল। প্রসেনজিৎবাবুর আগে দুজন রেঞ্জারের একজনকে গলা টিপে মেরে অন্যজনকে ভয় দেখিয়ে বাংলো ছাড়া করার পর থেকে সাহেব বাংলোর ভূত-মহিমা বেশ ভালভাবেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। জায়গাটাতে কেউই বিশেষ ঘেঁষতো না।

বাদ সেধেছেন প্রসেনজিৎবাবু। তিনি ভূতের ভয়ে বাংলো তো ছাড়লেনই না, বরং কলকাতা থেকে গোয়েন্দা এনেছেন ভূত-রহস্য সমাধান করতে!

যত সময় যাচ্ছে ভূতের মুখোশ ততই খুলে পড়ছে। এমনকি শেষ পর্যন্ত ঘরের মধ্যে ঢিল ছুঁড়ে শাসিয়ে পর্যন্ত জাত খোয়াতে হয়েছে ভূতকে।

আমার মনে হচ্ছে ভূত নাটকের শেষ দৃশ্য শুরু হতে আর বেশি দেরি নেই।

এখনও পর্যন্ত একটাই শুধু মস্ত ধাঁধা রয়ে গেছে–মৃত পশুপতিবাবুর জামার পকেটে ওই চিঠিটা। 'চন্দ্রাণীর শ্বশুরবাড়ি যাত্রা' অর্থে কী বোঝাতে চাওয়া হয়েছে?

ভাবতে ভাবতে বেশ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম।

হঠাৎ থপ্ করে কোলের ওপর কী একটা পড়লো। চমকে তাকিয়েই সারা শরীরটা হিম হয়ে গেল।

কালো কুচকুচে চেহারার এক পাহাড়ী বিচ্ছু। প্রায় ছ' ইঞ্চি লম্বা। মাথার সামনে বড় দুটো দাঁড়া, পেছনে বাঁকানো ভয়ংকর একটা হুল। সাক্ষাৎ যমের দোসর। একবার ও হুল শরীরে ফুঁড়লেই নির্ঘাৎ মৃত্যু।

সে মৃত্যুদূত আমার কোলে এসে পড়েছে। এখনও চুপচাপ বসে রয়েছে সেটা। আমি জানি এতটুকু নড়লেই ও সংগে সংগে হুল ফোটাবে আমার উরুতে।

আমি পাথরের মতো নিশ্চল হয়ে বসে রইলাম। কানের মধ্যে ঝিঁঝি পোকার তান শুনতে পাচ্ছি। ঠান্ডা রক্তস্রোত বইতে শুরু করেছে সারা শরীরের শিরা-উপশিরায়।

কালো বিচ্ছুটা দাঁড়া নাড়ছে আর একটু একটু করে ঘুরছে কোলের এদিক ওদিক। যে কোনো মুহূর্তে হুল ফোটাবে।

হায় ঈশ্বর! তবে কি এ ভাবেই বেঘোরে মৃত্যু লেখা ছিল কপালে? একটু বাদে প্রসেনজিৎবাবু বাংলোয় ফিরে দেখবেন আমার প্রাণহীন দেহটা বিষে জরজর হয়ে পড়ে রয়েছে বাংলোর বারান্দায়! তখন কি প্রথমে উনি ভাববেন দিনদুপুরে ডেনিস সাহেবের ভূতকে চোখের সামনে দেখেই ভয়ে হার্টফেল করেছি?

মস্তিষ্ক ক্রমেই যেন অসাড় হয়ে আসছে।

মৃত্যুদূত আস্তে আস্তে হাঁটুর দিকে এগুতে শুরু করেছে।

আমার শরীরটা যেন এঁটে গেছে চেয়ারের সংগে।

বিচ্ছুটা মাঝে মাঝে থামছে, সন্দেহজনক ভাবে শুঁড় দোলাচ্ছে, তারপর আবার এগিয়ে যাচ্ছে।

হাঁটুর বেশ কিছুটা নিচে নেমে এসেছেও। প্রতিটা মুহূর্ত যেন এক একটা যুগ...ও নামছে আমার বাঁ পা বেয়ে আরও নিচে...!

তারপর আমার কোলে এসে যেমন ভাবে পড়েছিল তেমনি ভাবেই হঠাৎ থপ করে খসে পড়লো মেঝের ওপর।

সংগে সংগে বিদ্যুৎবেগে লাফিয়ে উঠলাম। কাছেই একটা মুগুরের মতো কাঠ পড়েছিল। এক ছুটে সেটা নিয়ে এসে আঘাতের পর আঘাত হেনে থেঁতলে দিলাম মৃত্যু-দূতের ওই নিকষকালো দেহটা। শেষ মুহূর্তে ও ওর হুলটা বাঁকিয়ে দুমড়ে-মুচড়ে যেন চরম হিংস্রতার প্রকাশ দেখালো। চিটচিটে কালচে রসে ভিজে গেল জায়গাটা।

বিচ্ছুটাকে শেষ করে যখন সোজা হয়ে দাঁড়ালাম সারা শরীর ঘামে ভিজে গেছে। এলিয়ে পড়লাম চেয়ারের ওপর।

আর ঠিক সেই মুহূর্তেই চোখে পড়লো বাংলোর গেট ঠেলে প্রসেনজিৎবাবু ঢুকছেন।

[চলবে]

মানচিত্রে ইতিহাস

বাংলা ভাষাতে সর্বপ্রথম প্রকাশিত ছবি ও মানচিত্রের সাহায্যে ইতিহাস শিক্ষার অপূর্ব বই।

আদিম যুগের ভারতের মানচিত্র তারপর তার পরিবর্তন, আর্য যুগ, মহাভারত, অশোক থেকে বর্তমান পর্যন্ত ছবির সাহায্যে দেখান আছে।

এতে আছে ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্তম্ভ মন্দির ও পুরাকীর্তির সব প্রামাণ্য ছবি।

চার রঙের অফসেটে ছাপা ৯৪ পৃষ্ঠার বিরাট এই অসাধারণ বই

ষোল টাকা পাঠালে রেজিষ্টারী করে বই পাঠান হবে।

দেব সাহিত্য কুটীর

২১নং ঝামাপুকুর লেন· কলিকাতা- ৯

Registration No. W.B./E.C.–60 August '85 "Suktara"

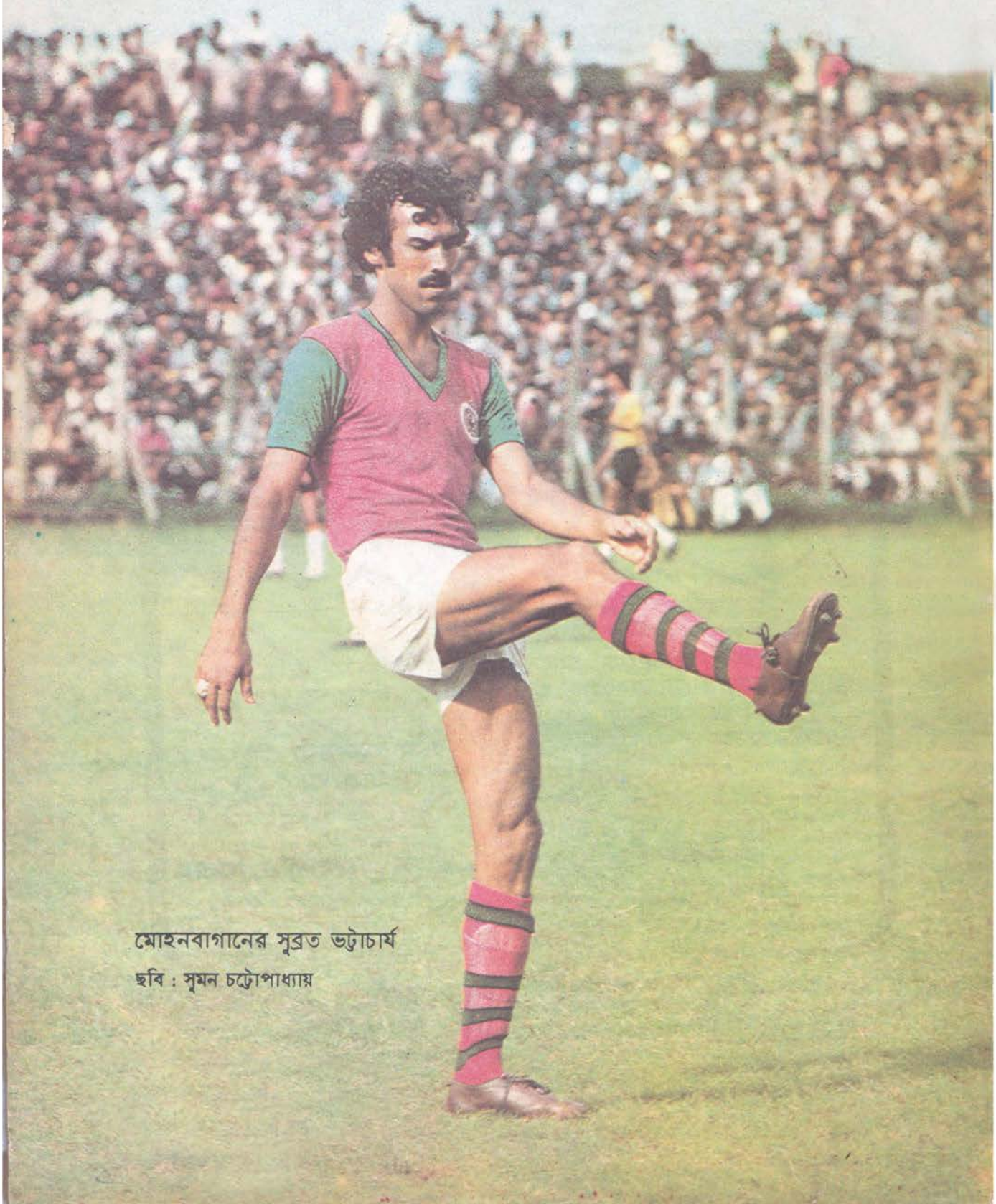

মোহনবাগানের সুব্রত ভট্টাচার্য

ছবি : সুমন চট্টোপাধ্যায়